বর্ষ ২০, সংখ্যা-২২, আশ্বিন, ১৪২৮

ISSN 2394-5656

শিশুসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা

লালপরি নীলপরি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের শিশুসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা ১৪২৮

সম্পাদক আসরফী খাতুন

সূচিপত্র

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'কিশোর রচনাসম্ভার' জীবনের সহজ পাঠ	৯	ড. দেবারতি জানা
জনার্দনের জর্দার কৌটো এবং পারিবারিক 'টক্সিক এফেক্ট'	১৭	ড. হাসনারা খাতুন
গল্প যেন বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের জলচ্ছবি	২৫	ড. জয়ন্তী মণ্ডল
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি গল্প : শিশু মনের আঙিনায়	৩০	ড. কমলচন্দ্র মণ্ডল
সত্য সুন্দর, মঙ্গলের আরাধনা : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'ইতি তোমার মা'	৩৫	ড. আসরফী খাতুন
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কিশোর গল্পের বড়মামা এবং মেজমামা	৪৬	ড. কৃষ্ণা ঝুল্কী
কিশোর মনস্তত্ত্ব ও চরিত্র গঠনে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের গল্প	৫৩	ড. মহব্বতুন্নেসা খাতুন
মানবিক আদর্শায়নে গল্পকার সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	৫৯	ড. কোহিনূর বেগম
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর দুটি গল্প	৬১	ড. আশিস কুমার নন্দী
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের চির কিশোর সত্তা : প্রসঙ্গ কাচ ও হাত না ডাল গল্প	৬৭	সুব্রত মণ্ডল
'দুইমামা' : জীবনের বর্ণময় আখ্যান	৭৪	তনুশ্রী হাঁসদা
বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনঃ সামনে দক্ষযজ্ঞ	৭৭	তপন নন্দী
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের শিশু-কিশোর সাহিত্য : বড়মামার মজাদার জগতের অনন্য আখ্যান	৮১	সাবানা পারভিন
রহস্যগল্পকার সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	৮৭	দীপান্বিতা সেন
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যে শিশু-কিশোর ভুবন	৯০	মুসা আলি
সবারে মাপা ছাগলের ছাতা	৯৬	অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী
ত্রিমুখ	১০৪	শম্পা হালদার
হাসির গল্পের ধারায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	১০৯	ইসমাতারা খাতুন
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি কিশোর গল্প : মূল্যায়ণ ও আলোচনা	১১৪	নমিতা হালদার
রহস্য রোমাঞ্চ থেকে প্রকৃতির সহজ সরল রূপের রূপকার সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : নির্বাচিত দুটি উপন্যাস	১২০	সুমিনা ফিরদোসী
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের শিশুসাহিত্যে শিশু মনস্তত্ত্ব ভাবনার রূপায়ণ	১২৫	সুচিত্রা কড়ার

‘দুইমামা’ : জীবনের বর্ণময় আখ্যান

তনুশ্রী হাঁসদা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ভিন্নরীতির সাহিত্যিক। নতুন রীতির ছোঁওয়া পাওয়া গেল তাঁর কলমে। হাসির মোড়কে পরিবেশিত হলো জীবনের কথা। দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট ঘটনা চিত্রিত হলো তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে। ‘দুই মামা’ গল্পকে কেন্দ্র করে দৈনন্দিন জীবনের বর্ণময় ঘটনা আলোচিত হলো এই নিবন্ধে।

শিশুপাঠ্য সাহিত্য রচনা বেশ জটিল ব্যাপার। শিশুর মনোজগতের কথা সাহিত্যের পাতায় তুলে আনা মোটেই সহজ বিষয় নয়। শিশুর ইচ্ছাপূরণের বিষয়ও সাহিত্যিককে মাথায় রাখতে হয়। গল্প- উপন্যাসে নাটকীয়তাও রাখতে হয় আবার শিশুর মনের প্রশান্তির কথাও ভাবতে হয়। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ‘দুইমামা’ গল্পে দৈনন্দিন জীবনের কথা নাটকীয়তার সাথেই উপস্থাপিত হয়েছে। দুই মামা গল্প শিশুভোগ্য হওয়ার পাশাপাশি বড়দের কাছেও সমান উপভোগ্য। এই রচনারীতির জন্যই সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় অনন্য।

শিশুদের কাছে মামাবাড়ি মানেই সব পেয়েছির দেশ। যেখানে শুধুই আনন্দ, তাইতো প্রচলিত ছড়াতেও ছড়িয়ে রয়েছে মামাবাড়ির আনন্দ ও মজা- ‘তাই তাই তাই/মামা বাড়ি যাই/মামাবাড়ি ভারি মজা/কিল চড় নাই।’ মামা বাড়ি জায়গাটি শিশুদের কাছে সর্বদাই ভীষণ প্রিয় একটি জায়গা। যার স্মৃতি পরবর্তী জীবনে, শত ব্যস্ততার মধ্যেও উঁকি দিয়ে যায়। সারা জীবনের জন্য গল্প রেখে যায়।

‘দুইমামা’ গল্পের ঘটনা দুই মামা কে কেন্দ্র করে এগিয়েছে। দুই মামার দৈনন্দিন জীবনের নাটকীয়তার দর্শক হলো ভাগ্নে। যে দুই মামার মাঝে পড়ে কখনো কখনো নিজেকে বিপন্ন মনে করেছে। দুই মামা অর্থাৎ বড়মামা, মেজমামার কাণ্ডকারখানা পাঠকের মনেও হাস্যরসের উদ্রেক ঘটিয়েছে। বড়মামা ভাগ্নেকে চোখ বন্ধ করে সাইকেলে যেমন বসে থাকতে বলেছেন, পাশাপাশি নিজেও চোখ বন্ধ করে সাইকেল চালিয়েছেন নর্দমায় পড়ে যাওয়া এবং গরুর গাড়ির সাথে ধাক্কা খাওয়ার ভয়ে।

বড়মামা পেশায় ডাক্তার হওয়ার পাশাপাশি পশু প্রেমিক। তাঁর পশু প্রেমের ঠেলায় বাকিদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। কখনো বড়মামার পোষা গরু মেজোমামার গাছ সাবাড় করেছে, কখনো খরগোশ ছোট মাসীর শাড়ী চিবিয়ে খেয়েছে। আবার কখনোবা পোষা কুকুর মেজোমামার জুতো চিবিয়েছে। তাই মেজ মামাও চুপ করে না থেকে বড়মামার কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে ‘বাড়িটা তো একটা চিড়িয়াখানা বানিয়েছো! ছটা গরু, কোনটার দুধ নেই। খাচ্ছে-দাচ্ছে, নাদা নাদা হাগছে। মশার চোটে বাড়ি টেকা যাচ্ছে না। চার-চারটে কুকুর, ঠাকুর ঘরে চুরি হয়ে গেল! দুটো কাকাতুয়া সারাদিন

চেল্লাচ্ছে। কার্নিসে এক ঝাঁক পায়রা অনবরত মাথায় পায়খানা করছে। বড় মামা খুব রেগে গেলেন, তাতে তোর কি, তোর কি অসুবিধে হয়েছে? মেজোমামার কাঁচ পরিষ্কার বন্ধ হয়ে গেল, আমার কি? তাই না? তোমার লাকি সকালবেলা কার্পেট ভিজিয়েছে। তোমার গরু লক্ষ্মী, সকালে আমার বাগানে ঢুকে সব গাছ মুড়িয়ে খেয়েছে। তোমার কাকাতুয়া সকালে ডানার ঝাপটা মেরে আমার চোখের চশমা ফেলে কাঁচ ফাটিয়ে দিয়েছে।' প্রতিবাদের ভঙ্গিমাতে বাড়ির অন্যান্যদের বিড়ম্বনার চিত্র ফুটে ওঠার পাশাপাশি হাস্যরসের উদ্রেক ঘটেছে।

ডাক্তার বড়মামা এবং প্রফেসর মেজোমামার কথোপকথন সবসময় হাস্যরসে মোড়া নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে 'বড়মামা আবার একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, লাকি, লাকির পেচ্ছাপ গোলাপ জল, জানিস ও রোজ ডগ সোপ মেখে চান করে। তুইতো সাত জন্মেও চান করিস না। মেজমামা কিছুক্ষণ বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপরই বিস্ফোরণ— 'ওঃ গোলাপ জল, তাই না! এবার থেকে বিয়ে বাড়িতে ওটাকে নিয়ে যেও, কাজে লাগবে। ভাড়া খাটাতে পারো তো, গোলাপ জল ছিটিয়ে আসবে।' উভয়ের বাক বিতণ্ডা ভাগ্নেকে কেন্দ্র করেও অন্যমাত্রা নিয়েছে 'মেজমামা কান খাড়া করে ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ, ভাগ্নে তোমার একলার নয়, আমাদের সকলের, আমরা সকলেই তার ভাগ পাবো।' সবকিছুর মধ্যে ভাগ্নে পড়েছে সংকটে, মামাবাড়িতে আদর তো রয়েছে,কিন্তু অতিরিক্ত আদরে বিড়ম্বনাও রয়েছে 'মেজমামা বললেন, ঘুরবি না, চুপ করে বসে থাকবি ঘরে, তুই আমাদের কমন ভাগ্নে। এমন জানলে কে আসত মামার বাড়িতে! দরকার নেই বাবা, মামার বাড়ির আদরে। আমি যে এখন কোন দলে যাই। মাসির কাছে যে ভিড়বো তারও উপায় নেই। তিনি তো সারাদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত আর নাচ নিয়েই ব্যস্ত।'

দুই মামার মধ্যে রয়েছে শিশুসুলভ মানসিকতা। দুজনের মধ্যে সর্বদাই বাক-বিতন্ডা হয় তা কিন্তু নয়, দুজনের মধ্যে রয়েছে মিষ্টি সম্পর্কও, রয়েছে উভয়ের উভয়ের প্রতি টান, রয়েছে দুজনের দুজনের প্রতি চিন্তা। মেজোমামার কাশি শুনে বড়মামা চিন্তিত হয়েছেন। বড়মামার জুতো হারিয়ে যাওয়ায় দুই মামা মিলে জুতো ভাগ করে পরেছেন 'ছ ফুট লম্বা বড়মামা আগে চলেছেন খালি পায়। আমরা পেছনে। মেজ মামা বললেন, নেবে নাকি আমার একপাটি জুতো? তোমার ডান পায়ে কড়া, আমার বাঁ পায়ে। ভালোই হয়েছে। ভাগাভাগি করে পরি। দে তাই দে। বড্ড লাগছে। বড় মামার করুন গলা। দু মামা ভাগাভাগি করে জুতো পরলেন। বড়োর ডান পায়ে, মেজোর বাঁ পায়ে জুতো।'

'দুই মামা' নিছক হাস্যরসের কাহিনী নয়, এখানে রয়েছে পারিবারিক জীবনের কথা, একে অপরের প্রতি ভালোবাসার কথা, রয়েছে পশু প্রাণীদের প্রতি মানুষের

দায়িত্বের কথা। যা শিশুদের মনে নীতিবোধ জাগিয়ে তোলে। পরিবেশের প্রতি শিশুদেরকে দায়িত্ববান করে তোলে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের শৈশব ছোটনাগপুর অঞ্চলে কেটেছে, সেই প্রাকৃতিক পরিবেশের ছোঁওয়া তাঁর লেখাতেও পাওয়া যায় 'স্বপ্ন দেখছি, আমি যেন ছোটনাগপুরের কোন এক প্রান্তরে অজস্র টিলার উপরে শুয়ে আছি। সবটাই অসমতল, ভীষণ লাগছে। মাঝে মাঝে ছুরির ফলার মতো কি যেন ঘাড়ের কাছে নরম জায়গায় খোঁচা মারছে।' বড়মামার সাইকেলে একটি কুকুর ধাক্কা খেলে তার প্রতি মামার দায়িত্ববোধ প্রাণীদের প্রতি ভালোবাসার বার্তা দেয়। আর মামা ও মাসিদের সম্পর্কতো শিশুসুলভ যা বড়দেরও ভালোবাসা ও সুসম্পর্কের বার্তা দেয় 'দু মামা আর এক মাসির কাণ্ডকারখানা চলছে এ বাড়িতে। বড়মামা ডাক্তার। মেজমামা প্রফেসর। মাসি সকালের স্কুলের টিচার। বাড়িতে গরু আছে, পাখি আছে, কুকুর আছে, বাগান আছে, একগাদা কাজের লোক আছে। মাঝে মাঝেই বড়মামা মেজ মামার লড়াই আছে, গলায় গলায় ভাব আছে।'

ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, জীবনের অসঙ্গতি ,পরিবেশের প্রতি দায়িত্ব, সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের দায়িত্ব সবকিছুই চিত্রিত হয়েছে হাস্যরসের উজ্জ্বল উদ্ভাসিত প্রকাশে, যা জীবনকে করে তুলেছে বর্ণময় আখ্যান।

ISSN : 2320-5598

লোকস্বর

নবম বর্ষ, ১৭তম সংখ্যা
মার্চ, ২০২১

PEER REVIEWED RESEARCH JOURNAL

সূচিপত্র

বাউল গান : লোকসংস্কৃতির প্রবহমান ধারা	রানু বিশ্বাস	১১
গাজন : বাংলার জনপ্রিয় লোকউৎসব	তরুণকান্তি মন্ডল	১৬
বহমান জীবন– ইন্দির ঠাকরুণ, হরিহর, দুর্গা...	সুষমা সেন	২২
শিবসংকীর্তন : বাংলার কৃষি ও কৃষকের আখ্যান	অরুণ সরকার	৩০
বাংলার মুখোশশিল্পীদের জীবন ও জীবিকার সমস্যা, সংকট এবং প্রতিকার	অন্তিমা ভট্টাচার্য	৪০
সাত্বত ও পাঞ্চরাত্র-সংহিতার আলোকে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাচীনতা	স্নেহাশিস রায়	৪৯
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার স্বরূপ অনুসন্ধান	রাকিবুল হাসান বিশ্বাস	৫৬
সমর সেনের কবিতায় দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ও মহামারি	আবদুল্লা রহমান	৭০
গণমাধ্যমে নারীচিত্রণ	মুনমুন দত্ত	৮৫
ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে নারীর মর্যাদা – একটি তাত্ত্বিক আলোচনা	জ্যোতি মিত্র	৯৬
‘একটি তুলসীগাছের কাহিনি’ : মানুষের উদাসীনতা ও ভালোবাসার গল্প	নকুলচন্দ্র বাইন	১১২
জনজীবনে পরিবেশ চেতনা : উৎসে ধর্মশাস্ত্র	সুস্মিতা নিয়োগী	১২০
মধুসূদনের নারীচেতনা	সোমা মন্ডল	১৩২
বনফুলের অণুগল্পে প্রেমভাবনা	অমরেশ মিত্র	১৪০
ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে নদীয়ায় শ্রীচৈতন্য ও জগন্নাথদেবের প্রভাব : রথযাত্রা ও রথ-সংস্কৃতি	রাস মোহন সরকার	১৪৯
শাইলকের বাণিজ্য বিস্তার : বিশ্বায়নের প্রতিস্পর্ধী আখ্যান	প্রশান্ত বিশ্বাস	১৫৮
মীর মশাররফ হোসেনের ‘এর উপায় কি?’	অভিজিৎকুমার ঘোষ	১৬৭
গ্রুপ থিয়েটারের উৎস সন্ধানে	প্রেম কুমার মণ্ডল ও উত্তম মণ্ডল	১৭৪
সাঁওতালী সমাজ এবং গণতন্ত্র	মিলন কিস্কু	১৮৭
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে গান্ধীবাদ	শিপ্রা বিশ্বাস	১৯৩
সুফীবাদ এবং বর্তমান সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা	এমিলি রুমি	২০৪
মহাশ্বেতা দেবীর কলমে ‘হুল’	তনুশ্রী হাঁসদা	২১০
ইতিহাসের আলোকে জন্ম দ্বি-শতবর্ষে ফিরে দেখা : প্রসঙ্গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	বাবলু সরকার	২১৭
বাংলা সাহিত্যে : প্রবাদ-প্রবচন একটি পর্যালোচনা	রণজিৎ কুমার বাউলিয়া	২২৪
রবীন্দ্র ছোটগল্পে নদী প্রসঙ্গ	সিদ্ধার্থ ঘোষ	২৪১
উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ	কৈলাশপতি সাহা	২৪৭

মহাশ্বেতা দেবীর কলমে 'হুল'

তনুশ্রী হাঁসদা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হেরম্বচন্দ্র কলেজ

সারাংশ : মহাশ্বেতা দেবী বাংলা কথাসাহিত্যে অন্যতম ব্যতিক্রমী লেখক। যাঁর কলমে বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয়, অন্ত্যজ, আদিম অধিবাসীদের জীবন চেতনা, যাপনচিত্র, প্রবহমান সংগ্রামের চিত্র বারে বারে উঠে এসেছে, যা বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মহাশ্বেতা দেবীর কলমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রান্তজনের কথা আদিমজনের কথা ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। ইতিহাসে নিমজ্জিত আদিবাসীদের সংগ্রামের কথা তুলে এনেছেন সাহিত্যের পাতায়। আদিবাসীদের জীবনকে জানার জন্য যাপনকে বোঝার জন্য বারে বারে ছুটে গেছেন পাহাড়, জঙ্গল অধ্যুষিত রুখা ভূমিতে। পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত 'তিলকা-সিধু-কানু-বিরসা'র লড়াইয়ের ইতিহাস তুলে ধরেছেন সাহিত্যে। আলোচ্য প্রবন্ধে মহাশ্বেতা দেবীর 'হুলমাহা' উপন্যাসে চিত্রিত আদিবাসীদের প্রবহমান হুল তথা বিদ্রোহের দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

সূচক শব্দ : হুল, সাঁওতাল, আদিবাসী, সিদু, কানু বিদ্রোহ, দিকু।

মূল আলোচনা

ভারতবর্ষের সভ্যতা মিশ্র সভ্যতা, আর্য অনার্য সংস্কৃতির সম্মিলনেই এই সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এই মিশ্রণ ভারতীয় সভ্যতার প্রথম লগ্ন থেকেই ছিল এবং এখন রয়েছে। আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণ সাহিত্যের নানান শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে। আদিবাসী সাহিত্য চর্চার বৃত্ত ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়েছে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত কথা সাহিত্যেও অনার্য সংস্কৃতি জায়গা করে নিয়েছে। তিরিশের দশকে কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে আদিবাসী জীবন, ও সমাজের কথা সাহিত্যে উপস্থাপিত হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে উঠে এসেছে আদিবাসীদের সংগ্রামের কথা, জীবন যাত্রার কথা। এই ভাবেই ধীরে ধীরে সচেতন ভাবে বাংলা সাহিত্যে ব্যাতিক্রমী ধারা গড়ে উঠছিল, যে ধারার

অন্যতম স্বতন্ত্র লেখক মহাশ্বেতা দেবী।

মহাশ্বেতা দেবীর কলমে আদিবাসী জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি এবং সংগ্রামের কথা উঠে এল। যে সমাজ জীবন তথাকথিত উচ্চবর্গের কাছে শতযোজন দূরের। যাদের জীবন সংগ্রাম কালের গর্ভে ছিল নিমজ্জিত, মহাশ্বেতা দেবী তুলে আনলেন সাহিত্যের পাতায়। সাহিত্যে অবহেলিত আদিম জনগোষ্ঠী তাদের প্রাচুর্য নিয়ে উঠে এল মহাশ্বেতা দেবীর কলমে। তাঁর লেখাতে তিলকা-সিধু-কানু-বিরসার সংগ্রাম, তাদের আপোষ না করা জেদ, তার সাথেই আদিবাসীদের জীবন সংস্কৃতি জায়গা করে নিল।

'হুলমাহা' উপন্যাসে সিদু-কানু-চাঁদ-ভৈরবের দ্বারা সংঘটিত লড়াই-এর কথা আমরা পাই। যে লড়াই সংঘটিত হয়েছিল ব্রিটিশ ও বহিরাগত দিকুদের বিরুদ্ধে। 'হুল' শব্দের অর্থ বিদ্রোহ, 'মাহা' শব্দের অর্থ দিন, অর্থাৎ 'হুলমাহা' শব্দের অর্থ বিদ্রোহের দিন। 'হুলমাহা' শব্দটি অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত মুন্ডারী শাখার সাঁওতালি শব্দ। সিধু-কানুর হুল হয়েছিল ১৮৫৫ খ্রিষ্ঠব্দে। ১৮৫৫-এর হুলের আগেও ব্রিটিশ ও দিকুদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে হুল সংঘটিত হয়েছিল যার নেতৃত্বে ছিল তিলকা মুরমু।

আদিবাসীদের বিদ্রোহের ধারাবাহিকতা এটাই প্রমাণ করে তাদের জীবনে সংগ্রাম প্রবহমান। আদিবাসীরা বরাবর শান্তিপ্রিয়, গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ। তারা স্বাধীনচেতা, স্বাধীনভাবে বাঁচতে চেয়েছিল, যেখানে ধার কর্জ থাকবে না, কেউ তাদের অসভ্য জাতি বলবে না। আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ করে সাঁওতালদের মধ্যে এই সচেতনতা তৈরি হয়েছিল, যে তারা অপরের অধীনে বসবাস করবে না। তারা গ্রাম মাঝির অনুশাসন চেয়েছিল। নিজেদের চাষের ফসল নিজেরা তুলতে চেয়েছিল। ফলস্বরূপ সাঁওতালরা বিরোধী অবস্থানে চলে গেল। তাদের প্রতি হওয়া অন্যায়ের তারা প্রতিবাদ করল। সিদু-কানু-চাঁদ-ভৈরবের পরিচালনায় সাঁওতালরা একত্রিত হল, শুধু সাঁওতালই নয় সমগ্র আদিবাসী সমাজ এবং তথাকথিত হিন্দু সমাজের অন্তর্গত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল।

চুনারাম মুর্মুর চার ছেলে সিদু-কানু-চাঁদ-ভৈরব। চার ভাই দিকুদের জুলুম থেকে, দাসত্ব থেকে আদিবাসীদের মুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছিল। সিদু বাবা তিলকা মাঝির দেখানো পথেই পথ খুঁজে পেয়েছিল "সিদু বলে, আর নয়, এবার আর নয়। জঙ্গল মহালে, পাহাড়িয়া জাতে হুল্, তাতে দামিন-ই-কোহ্, পত্তন। দামিনে জোরজুলুম, তিলকা মাঝির হুল্। দামিনে আবার জুলুম – মাটি কেউ সঙ্গে আনে নাই, নিয়েও যাবে না।"[১] 'দামিন-ই-কোহ্' তে বহিরাগত ব্রিটিশ ও দেশীয় দিকুদের অত্যাচার সাঁওতালরা আর মুখ বুজে সহ্য করতে পারছিল না। নিজেদের তৈরি করা জমিতে, খুটকাট্টি গ্রামে তাদের অধিকার থাকছিল না। একদিকে ঋণের ফাঁদ অপরদিকে বিপুল খাজনার চাপে তাদের

নাভিশ্বাস উঠছিল। মহাজনের চক্রান্তে সরল সাঁওতালদের ঋণ শোধ হত না ফলস্বরূপ বংশপরম্পরায় বেঠ বেগারী করে যেতে হতো, তার সাথে ছিল শারিরীক অত্যাচার "শোধ নেবার সময়ে একগাড়ি ধান দিলেও মহাজনের কয়াল বলে, দশসের হল বাবা, এখনো বাকি থাকল। এই 'বাকি' থাকার দায়ে তারা সাঁওতালদের বাঁধাবেগার করে ফেলে। বাঁধাবেগার কি হবে? বাপ তোমার ঘরে বেগার খেটে মরে যাবে, ছেলে আসবে বাপের ঋণ শোধ করতে। তারপর আসবে তার ছেলে। সাঁওতালটি বুঝতে পারছিল যে, কর্জ তার শোধ হল না। কপালে তার অশেষ দুঃখ আছে।"[২] দিন দিন সাঁওতালদের ওপর জুলুম বেড়ে চলছিল। সাঁওতালরা কথা না শুনলে মিথ্যা ঋণের দায়ে, মিথ্যা অভিযোগে জেল হাজতে ভরে দেওয়া হত। আদালতে সাঁওতালদের হয়ে কথা বলার কেউ থাকত না "ধূর্ত বাঙালী ব্যবসায়ী - মহাজন - নায়েব দারোগার সাহায্যে সাঁওতালদের যখন আদালতে নেয় সাঁওতালরা দেখে তাদের জন্য কোনো বিচার নেই।"[৩]

সাঁওতালরা বুঝতে পারছিল একজোট হয়ে রুখে না দাঁড়ালে শোষণ অত্যাচারের হাত থেকে তাদের মুক্তি নেই। বাবা তিলকা মাঝির মতই হুল করতে হবে এটা তারা বুঝেছিল। সিদু-কানু নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। সিদু সাঁওতালদের কাছে বার্তা দিল "সন্তাল দেশ সন্তালের হবে।"[৪] যত দিন যাচ্ছিল সাঁওতালদের ক্ষোভ ছাইচাপা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ছিল "এমনি করেই তুষানলে বাতাস লাগছিল। চাপা আগুন ছড়াচ্ছিল। কলকাতায় ছোটলাট হ্যালিডে ও বড়লাট ডালহৌসি এসব কিছুই বোঝেননি। তাঁরা শোনেন নি দূর-দূরান্তের গ্রামে গ্রামে গান, শোনেন নি নাগরার গম্ভীর ও ভীষণ আহ্বান।"[৫] সাঁওতালদের ক্ষোভের খবর বড়লাট, ছোটলাট রাখেন নি। সুদূর দামিনের খবর রাখার কথা কলকাতার মনে হয়নি। তারা শুধু সাঁওতালদের কাছে জোর করে আদায় করা খাজনার খবর রেখেছিল। আর দেশীয় প্রশাসন, জমিদার, মহাজন অর্থাৎ দিকুরা জোর করে, ভয় দেখিয়ে সাঁওতালদের দমিয়ে দেবে ভেবেছিল। তারা মনে করেছিল সাঁওতালরা বিদ্রোহের পথে এগোতে পারবে না, তার সঙ্গে তারা এটাও জানে সাঁওতালরা সরল, শান্তিপ্রিয়। তাই মহেশ দারোগার মত লোভী শাসক ভেবেছিল সাঁওতালদের পক্ষে সম্মুখ সমরে যাওয়া সম্ভব নয় "মহেশ দারোগার কানেও পৌঁছেছিল নানা খবর। সে ছেঁড়া কথায় কান দেয়নি। কেনারামকে বলেছিল, এমন সহজে ঘাবড়াও কেন ভকতবাবু? সাঁওতালদের ডর কিসের? যে জাত মিছে বলে না, ঠক জালি জানে না, অধর্মকে ডরায়, সে জাতকে ডর নাই।"[৬] সাঁওতাল হুলের প্রধান নেতৃত্ব মহেশ দারোগাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল সরল, শান্তিপ্রিয় মানুষদের দিনের পর দিন অসহনীয় অত্যাচার করে গেলে তারাও প্রতিবাদ করতে পারে।

সাঁওতালরা গ্রামে গ্রামে শাল গিরা পাঠাতে লাগল। শাল গাছের ডালকে তারা বার্তা পাঠানোর জন্য ব্যবহার করত। শাল গাছের ডাল বৃহৎ আলোচনা, আন্দোলন ও বিদ্রোহের বার্তা বহন করে। শাল গিরা দেখেই সাঁওতাল মানুষ বুঝতে পারত বিদ্রোহে সামিল হওয়ার বার্তা এসেছে। বিভিন্ন সাঁওতাল গ্রাম থেকে নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে মানুষ ভগনাডিহিতে আসতে লাগল। সমস্ত পাহাড়, জঙ্গলে হুলের প্রতিধ্বনি শোনা যেতে লাগল, যে রাস্তা তিলকা মাঝি দেখিয়ে গেছে সেই রাস্তাতেই সিদু-কানু এগোতে লাগল "বাবা তিলকা মাঝি বলছে, হুল না হলে আমার তেলনাহান হবে না, ভদরী হবে না। আমি সব জানতে পারছি, সব দেখতে পাচ্ছি। তুই আমার কান দিয়ে শোন্। আমার চোখ দিয়ে দেখ্। বাতাস বলছে হুলমাহা! হুলমাহা! হুলমাহা! শালগাছের ডাল নাচছে, আছাড় খাচ্ছে, ভেঙে নে, গিরা দে! ভেঙে নে, গিরা দে!"[৭] ছোটোনাগপুর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ, রুখাভূমিও বহিরাগত দিকু ও ব্রিটিশদের হাত থেকে যেন মুক্তি চাইছে।

সিদু-কানুর নেতৃত্বে সাঁওতালদের পাশাপাশি অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠী ও তথাকথিত নিম্নবর্গীয়, অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ বিদ্রোহে শামিল হতে লাগল। আদিবাসীদের সাথে তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের বন্ধুত্ব উচ্চবর্গীয় দিকুদের কাছে যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়ে উঠছিল "নগিনদাস বলল, বাঁধনার আগে নতুন কাপড় বেচার সুখ আর থাকবে না। ওরা দিকুর ঘরে কাপড় কিনবে না। হয় নিজেরা বুনবে, নয় মোমিনের কাপড় নেবে। - তা তো নেবেই। ডোম-মোমিন-কুমোর-কামার সব তো ওদের বন্ধু।"[৮] কামারেরা সাঁওতালদের কাছে নগেন দাসের মত মানুষদের জোচ্চুরি ধরিয়ে দিয়েছিল, কিভাবে তারা ছোটো বাটখারা ব্যবহার করে জিনিস দিত এবং বড় বাটখারা ব্যবহার করে সাঁওতালদের কাছ থেকে জিনিস নিত। এইভাবেই আদিবাসীদের সাথে অন্ত্যজরা হুলে সম্মিলিত হচ্ছিল "ডোমরা আছে, কামার-লোহারদের সাথি পাব। তারা সন্তাল নয়, কিন্তুক দিকুও নয়। দুঃখীজন দিকু হয় না। দিকুর চেহারা দেখলে চিনা যায়।"[৯]

সাঁওতাল সহ আদিবাসীদের অন্যান্য গোষ্ঠী এবং অন্ত্যজ শ্রেণির ব্রিটিশ ও দিকুদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত অবস্থান সম্পর্কে বড়লাট, ছোটলাটের পাশাপাশি ভারতবর্ষের, তৎকালীন রাজধানী কলকাতাও অজ্ঞাত ছিল। কলকাতা থেকে আঠারো-উনিশখানা সংবাদ পত্র বেরোচ্ছে কিন্তু কোথাও সিদু-কানুর নেতৃত্বে বিদ্রোহের আলোচনা হচ্ছেনা। যে ব্রিটিশ রাজ অনেক দেরীতে তথাকথিত এলিট মানুষের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল তা নিয়ে বহু পূর্বে ভারতবর্ষের এক প্রান্তের প্রান্তবাসীরা বিদ্রোহ করছিল তা নিয়ে শিক্ষিত বাঙালি ভাবতে চায়নি। দেশ মানে তো শুধু কলকাতা সেখানে আদিবাসীদের সম্পর্কে আলোচনা ঠাঁই পেতে পারে না "না, উনিশ শতকের

মহাজাগরণের আলো শিক্ষিত বাঙালির চোখকে এমন ধুয়ে দিয়েছিল যে কোথায় দামিনে এক বিশাল উন্নত কৃষি সভ্যতা ধ্বংস হতে বসেছে তা তাঁরা চোখ মেলে চেয়ে দেখেন নি।"[১০] সাঁওতাল, আদিবাসীরা শহুরে শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও সভ্যতার বিবর্তন বুঝতে পারছিল। বুঝতে পারছিল ব্রিটিশ শাসকেরা কি চাইছে আর তাদেরকে দিকুরা কেন সাহায্য করছে, বুঝতে পেরে বুক চিতিয়ে বন্দুকধারী চতুর সভ্যতার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে "শহর-কলকাতা এ সভ্যতাকে আসন পেতে দিচ্ছিল। দামিন-ই-কোহ্, এ সভ্যতাকে বর্জন করে মুক্তিস্নানে পবিত্র হতে চাইছিল।"[১১] শুধু দামিন নয়, বীরভূম, ভাগলপুর, হাজারিবাগ, মানভূম থেকেও সাঁওতালরা ভগনাডির পথ ধরল "১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জুন বৃহস্পতিবার ভগনাডি গ্রামের দক্ষিণ-পূবের মাঠে এক প্রাচীন ও বিশাল বটগাছের সামনে হাজার হাজার সাঁওতাল জমা হয়েছিল। তারা যে কতহাজার, কে তা বলবে? কে হিসাব রেখেছিল? মাঠে যদি বা দশ হাজার সাঁওতাল থাকে, আরও তো সাঁওতাল আসছিল।"[১২] সাঁওতালরা বিদ্রোহের আগুন জ্বালাল। যে আগুন ব্রিটিশ রাজের মনে ও দিকুদের মনে ভয় ধরাতে সক্ষম হল।

বিদ্রোহ দমনের কথা উঠল। কমিশনার বুঝল বিদ্রোহের নেতাদের বন্দী করতে হবে। ব্রিটিশ সরকার গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র বাহিনী পাঠাতে লাগল, গ্রামের পর গ্রাম আগুন জ্বলতে লাগল। শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মহিলাদের ওপর অত্যাচার চলতে লাগল। 'সম্বাদ প্রভাকর' ছাড়া অন্যান্য দেশীয় কাগজ পত্র ব্রিটিশ রাজকে, তাদের বিদ্রোহ দমনের পন্থাকে সমর্থন করেছিল "সকলেই সরকারকে সমর্থন করছে। শুধু 'সম্বাদ প্রভাকর' বলেছে, তাও একদিন, যে সাঁওতালরা অকারণে বিদ্রোহ করেনি।"[১৩] যত দিন যেতে লাগল সাহেবরা বুঝল বিদ্রোহ দমন করা সহজ নয়। সিদু-কানু যুদ্ধে জখম হয়েও বিদ্রোহ জারি রেখেছে পাশাপাশি হাজার হাজার মানুষ সিদু-কানুর হাত ধরে এগিয়ে এসেছে "হাজার হাজার সিদু-কানু? সবাই লড়াইয়ে নেমেছে? স্বাধীন সাঁওতালরাজ? এ বিদ্রোহ দমন করতেই হবে।"[১৪] বন্দুকের গুলিতে হাজার হাজার সাঁওতাল ও অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষ প্রাণ দিল। বন্দুকের সামনে শুধু তির, ধনুক, কুড়াল, টাঙি তবু বিদ্রোহীরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলনা। ভাগলপুরের কমিশনার দামিনে মার্শাল ল ঘোষণা করল। সিদু-কানু ও অন্যান্য নেতাদের মাথার ওপর পুরষ্কার ঘোষণা করল। ভাগলপুরে চাঁদ ও ভৈরবের সাথে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যুদ্ধ হয়। তিরের চেয়ে বন্দুক অনেক বেশি শক্তিশালী। যুদ্ধক্ষেত্রে চাঁদ ও ভৈরবের মৃত্যু হয়, কিন্তু সিদু-কানু বেঁচে থাকায় সরকারি অফিসাররা নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। ওপরবাঁধ থেকে বন্দী করা হল কানুকে আর কুমড়াবাদ থেকে সিদুকে। চতুর ইংরেজ সরকার দুই প্রধান নেতাকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল "দামিনে বিদ্রোহের ফলে

দশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার সাঁওতাল নিশ্চয় নিহত হয়েছে। কিন্তু দুই প্রধান নেতাকে ফাঁসি দিলে তবে তো সাঁওতালরা আর তাদের অনুসারী যত গরীব হিন্দুরা, মোমিনরা, এরা স্বীয় অপরাধের গুরুত্ব বুঝবে। বুঝবে যে স্থিতাবস্থাই ভালো। বিদ্রোহ করার মতো মূর্খামি আর নেই। আর বারহাইতে সিদুকে নিয়ে আসার তাৎপর্য সে জন্যেই বড়ো গভীর।"[১৫] ভগনাডির মাঠে ১৮৫৬ সালে সিদুর অতি চেনা মহুয়া গাছে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ফাঁসি দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখী নিপীড়িতের অন্তরে সিদু থেকে যায় মৃত্যুহীন, অন্তহীন। ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে কানু মুর্মুর ফাঁসি হয়। দামিন্-ই-কোহ্ এর অরণ্যে ধ্বনিত হয় "কানু বলল, আবার আমি আসব, ফিরে আসব, আবার, আবার আসব।"[১৬]

আদিবাসী মানুষের মারাং দাই (বড় দিদি) মহাশ্বেতা দেবী নিজের কাজের মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের পাশে থেকেছেন। অবস্থানগত পার্থক্য আদিবাসীদের নিকটজন হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কৃষ্ণভারতের কথা তাঁর কলমে উঠে এসেছে "মাথায় প্রদীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই কৃষ্ণবর্গই আসলে কৃষ্ণভারতের 'নিম্নবর্গ।"[১৭] সামাজিক বিন্যাসে যাদের অবস্থান নিম্নবর্গে। যারা পিলসুজের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে আলোকহীন। যাদের সংগ্রামের কথা, জীবনের কথা ইতিহাসের গর্ভে মলিন ভাবে পড়ে থাকে। 'হুলমাহা' উপন্যাসে সেই বিদ্রোহ সাহিত্যের আঙিনাতে যথাযথ ভাবে, সঠিক তথ্য সহকারে উপস্থাপিত হলো মহাশ্বেতা দেবীর কলমে।

তথ্যসূত্র

১। মহাশ্বেতা দেবী, হুলমাহা, রচনা সমগ্র ১১, দে'জ ২০০৩, পৃ. ৮৮
২। তদেব, পৃ. ৮৭
৩। তদেব, পৃ. ৯১
৪। তদেব, পৃ. ৯০
৫। তদেব, পৃ. ৯১
৬। তদেব, পৃ. ৯১
৭। তদেব, পৃ. ৯৫
৮। তদেব, পৃ. ৯৬
৯। তদেব, পৃ. ৯১
১০। তদেব, পৃ. ৯২
১১। তদেব, পৃ. ৯২
১২। তদেব, পৃ. ৯৬

উদ্দালক

UDDALAK

(সপ্তদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : জানুয়ারি-জুন, ২০২৩)

A Peer-Reviewed International
Multidisciplinary Academic Journal
ISSN : 2320-9275

প্রধান সম্পাদক

ড. সন্তোষকুমার মন্ডল

যুগ্ম সম্পাদক

ড. অনুপ বিশ্বাস ও ড. সৌরভ দাস

গোপীনাথ দাস	নজরুল-সাহিত্যে কৃষি ও কৃষক সমাজ : একটি অনুসন্ধান	১৪৫
চন্দ্রিমা কর্মকার	সন্মাত্রানন্দের 'তোমাকে আমি ছুঁতে পারিনি' উপন্যাসে পাওয়া ও না-পাওয়ার দর্শন	১৫৭
ছোটন মণ্ডল	'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের ভাষাশৈলী	১৬৮
জ্যোতি মিত্র	ভারতে মানবাধিকার আন্দোলন : আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট	১৭৮
ঝুমা দত্ত	নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' ও 'পাণ্ডব গৌরব' নাটকে পৌরাণিক ভাবনা : একটি বিশেষ অধ্যয়ন	১৯০
তনুশ্রী হাঁসদা	'শালগিরার ডাকে' : আদিবাসী যুবকের বীরগাথা	১৯৮
তন্ময় রায়	সমসাময়িক পত্রিকায় বিংশ শতকের বাঙালি সমাজ : স্বদেশি আন্দোলন ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক (১৯০০-১৯৪৭)	২০৪
দয়ানন্দ মাঝি	কালের স্রোতে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কালিদহ'	২১২
দীপক হাজরা	দেশভাগের খুঁটিনাটি : প্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিকতা	২১৭
নীলকমল বাগুই	পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত নাটকে মনুষ্যত্বের অনুসন্ধান	২২৩
প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত	চৈতন্য-পার্ষদ রাঘব পণ্ডিত	২৩৪
পরিতোষ কুমার পাল	ব্যবহারিক বেদান্তের প্রেক্ষিতে বিবেকানন্দ	২৪২
পরিমল মণ্ডল	২০২০ এর জাতীয় শিক্ষানীতি এবং ভারতীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষার এক নবযুগের সূচনা	২৪৬
প্রসেনজিৎ রায়	বাংলা শিশু-কিশোর গল্পে হাস্যরস : ভাবনার নানাদিক	২৫৪
ফিরোজ খান	দেশভাগের স্মৃতি সত্তা ও ভবিষ্যৎ : নির্বাচিত ছোটোগল্পের আলোকে	২৬২
বিকাশ নস্কর	সুন্দরবনের সংগ্রামশীল জীবন ও তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প	২৭৫
বিশ্বজিৎ মণ্ডল	প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে দাম্পত্য সমস্যা এবং	২৮৪
বিশ্বজিৎ রায়	সৃষ্টি সম্পর্কে : সাংখ্যদর্শন	২৯৮
মধুরা চক্রবর্তী	প্রমথ চৌধুরীর 'মহাভারত ও গীতা' : একটি পর্যালোচনা	৩০৪

UDDALAK
ISSN : 2320-9275

'শালগিরার ডাকে' : আদিবাসী যুবকের বীরগাথা

তনুশ্রী হাঁসদা

ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-সংস্কৃতি সমন্বিত এক দেশ। সমন্বয়ের ধারা সমৃদ্ধ করেছে বাংলা সাহিত্যকে। সাহিত্যের নানান শাখায় উঠে এসেছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা, গোষ্ঠীর রীতি-নীতির কথা। কালের গর্ভে লুকিয়ে থাকা ইতিহাস সাহিত্যিকের দক্ষ কলমে জায়গা করে নিয়েছে সাহিত্যের পাতায়। তিরিশের দশকের কথাকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে সাহিত্য জগতে আদিবাসীদের গোষ্ঠীজীবন জায়গা করে নিল। পরবর্তী সময়ে অন্যতম ব্যতিক্রমী লেখক মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য চর্চায় জায়গা করে নিল আদিবাসীরা। দুর্গম গিরি কন্দরে লুকিয়ে থাকা ইতিহাস উঠে এলো তাঁর গল্প-উপন্যাসে। মহাশ্বেতা দেবীর লেখা 'শালগিরার ডাকে' গল্পে উঠে এসেছে বিস্মৃত প্রায় এক আদিবাসী যুবকের বীরগাথা। আলোচ্য প্রবন্ধে আদিবাসী বিদ্রোহের পাশাপাশি তাদের যাপন চিত্রও তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

সূচক শব্দ : আদিবাসী, সাঁওতাল, তিলকা, কোম্পানি, বিদ্রোহ।

মিশ্র সভ্যতার দেশ ভারতবর্ষ। এই মিশ্রণ সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত সমৃদ্ধ করেছে বাংলা কথা সাহিত্যকেও। সাহিত্যের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে আদিবাসী জীবন, আদিবাসী সমাজ। তিরিশের দশকের কথাকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে সাহিত্য জগতে আদিবাসী জীবনের পথ চলা শুরু যা এখনও বিদ্যমান। আদিবাসী জীবন চর্যা হয়ে বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী ধারা। এই ব্যতিক্রমী ধারার স্বতন্ত্র লেখক মহাশ্বেতা দেবী। আদিবাসী জীবন ও তাদের সংগ্রামের চিত্র সাহিত্যিকের দক্ষ লেখনীতে জায়গা করে নিল গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধে। অবহেলিত আদিম জনগোষ্ঠী তাদের প্রাচুর্য ও ঐতিহ্য নিয়ে উঠে এল মহাশ্বেতা দেবীর কলমে।

কালের গর্ভে নিমজ্জিত আদিবাসী যুবক তিলকা মাঝির সংগ্রামের কথা তুলে ধরা হয়েছে 'শালগিরার ডাকে' গল্পে। শালগিরা অর্থাৎ বিদ্রোহের বার্তা ১৭৫০ সালের ইতিহাস উঠে এসেছে এই গল্পে। যে ইতিহাস সাঁওতাল, পাহাড়িয়া, মালপাহাড়িয়াদের। ছোটনাগপুর অঞ্চলের দুর্গম পাহাড়, জঙ্গলে যাদের বসবাস। তথাকথিত সভ্য সমাজ থেকে যাদের অবস্থান শত যোজন দূরে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে গড়ে ওঠা সভ্যতা আদিম সভ্যতা যে তার প্রাচুর্য নিয়ে সাক্ষী হয়ে থেকেছে। এই

সভ্যতার বিস্তার "ভারতের ইতিহাসে বহু কথার নীরব সাক্ষী ভাগীরথীর পশ্চিমে রাজমহল থেকে জঙ্গল এলাকার বিস্তার ওদিকে হাজারীবাগ ও মুঙ্গের অবধি — উত্তরে ভাগলপুর থেকে দক্ষিনে বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ অবধি।"[১] বিস্তৃত এলাকা জুড়ে আদিবাসীদের নিজস্ব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আদিবাসীরা পাহাড়-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ভূমিতে স্বাধীন ভাবে বসবাস করছিল। 'পরাধীনতা' শব্দটি তাদের কাছে ছিল অজানা। জঙ্গল হাসিলি জমিতে তারা ধান, ডাল, সর্ষে চাষ করত। মহুয়ার তেলে বাতি জ্বালাতো, রিঠা দিয়ে কাপড় কাচত। তুলো সংগ্রহ করে নিজেদের জন্য কাপড় বুনত। লবণের প্রয়োজন হলে দূরের হাটে চলে যেত। এই ছিল ১৭৫০ সালে ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের জীবনযাত্রার চিত্র।

১৭৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের তীব্র শীতের দিনে বীর সুন্দ্রা মুর্মুর ঘরে জন্ম নিল তিলকা। সুন্দ্রা মুরমুর বাবা ছিল গ্রামপ্রধান। যাকে আদিবাসীরা বলে মাঝি, শব্দটি অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত। তিলকার পরিবার ছিল মাঝি বাবার পরিবার। তাই তিলকার নামের সাথেও মাঝি শব্দটি যুক্ত হয়েছে। তিলকার জন্মের পর সুন্দ্রা মুরমুর বাবা হাতির হানাতে মারা যায়।

তিলকার জন্মের বছরেই বর্গী হানা হয়েছিল। নিষ্ঠুর বর্গিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ নদী পেরিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে পালিয়ে আসে সাঁওতালদের গ্রামে। সাঁওতালদের সংলগ্ন এলাকায় কামার-কুমোর-ছুতোর-তেলি সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করতে শুরু করে। সাঁওতালরা সহজেই তাদেরকে আপন করে নেয়, সাথে কিছু শর্তও দেয় "কিন্তু গ্রামে গ্রামে আমাদের সমাজপতিদের শাসন মানতে হবে। বেইমানি নয়, বিবাদ নয়, মিথ্যা কথা নয়।"[২] বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি সহাবস্থানের ফলে এক নতুন লোক-বৃত্ত গড়ে উঠলো।

তিলকা বড় হতে থাকে। গড়ম বাবা (ঠাকুর দাদা) বলতে সে জানে, গড়মবাবার ব্যবহৃত তীর ধনুক। আটবছরের বালক হাতে তুলে নেয় তীর ধনুক। এদিকে ভারতবর্ষে শাসন ব্যবস্থার পটপরিবর্তন হল "সেই ১৭৫৭ সালেই তোমাদের গ্রামের পূবে ভাগীরথীর ওপারে কি কাণ্ডটা হয়ে গেছে পলাশী নামের একটা জায়গায়, রাজায়-রাজায় এক যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলায় বাংলার নবাব হেরে গেছেন, খুন হয়ে গেছেন। সাহেবদের দেওয়া তাজ মাথায় পড়ে নবাব হয়েছে মীরজাফর।"[৩] শাসকের পরিবর্তন, শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন আদিবাসীদের জীবনে নিয়ে এলো এক নতুন সমস্যা। আদিবাসীরা স্বাধীন ভাবে বসবাস করছিল সেখানে কোন শাসকের অস্তিত্ব ছিলনা। মোগল আমলে এই দুর্গম অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে কেউ খাজনা চায়নি। বর্গি হানায় পালিয়ে আসা খেটে খাওয়া মানুষের সাথেও আদিবাসীদের সমস্যা হয়নি। স্বাধীনচেতা আদিবাসীদের কাছে সাহেবদের শাসন পদ্ধতি হয়ে উঠছিল পরাধীনতার শিকল স্বরূপ।

তিলকা ডাকাবুকো এবং শালগাছের মত শক্ত দেহের কিশোর। চোদ্দ বছর বয়সে তিলকা শিকার উৎসবে অংশ নিল। এই উৎসব আদিবাসীদের উৎসব। তিলকা তার বাবা সুন্দ্রা মুরমুর সাথে শিকার উৎসবে গিয়ে জানতে পারল সমাজের বাঁধন কাকে বলে তিলকা বুঝল তাদের সমাজ কত বড় সবাই বেঁধে আছে গিরার বাঁধনে "সব হেমব্রম-মুর্মু-টুডু-কিসকু-সরেন-হাঁসদা-বাস্কে গিরার বাঁধনে বাঁধা। সকলে এক পরব করে, একভাবে গান বাঁধে ও নাচে, এক সার বেঁধে চলে, এ-ওর চাষেবাসে সাহায্য করে, একভাবে সমাজের শাসন মানে। এই ভরসা আছে বলেই সাঁওতাল এমন আত্মস্থ, আত্মসম্মানী।"[৪]

১৭৬৫ সালে কোম্পানি বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি নিল। তিলকারা তখন ধান রোয়ার কাজ করছে। বীরগঞ্জের হাটে কোম্পানির গোলদার আদিবাসীদের দেখে হাটের আড়তদারের কাছে জানতে চাইলো "এরা কারা কালো কালো মানুষ"[৫] কোম্পানির গোলদার আড়তদারের কাছ থেকে আদিবাসীদের নিষ্কর স্বাধীনভাবে বাসের কথা জানল। তাদের কৃষি কাজের কথা জানল। কিছুদিন পরে দেখা গেল কোম্পানির লোক বিভিন্ন হাটে গিয়ে চাল কিনছে। কোম্পানি মন পিছু চার আনা দিচ্ছে। কোম্পানির এই কাজে সাঁওতালদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। অপরদিকে পাহাড়িয়া গোষ্ঠীরা চাল বেচতে শুরু করেছিল "হাট থেকে ফেরার সময় তিলকাও বলল, আপুং, এ কি শুরু হয়েছে? নতুন ধান-চাল সব নাকি বেচে দিচ্ছে পাহাড়িয়ারা? ঘর খালি করে ডোল ডোল চাল বাইছে!"[৬] তিলকা মুরমু এবং অন্যান্য সাঁওতালদের মনে হয়েছিল কোম্পানির মতলব ভালো নয়। তারা সব চাল কিনে কলকাতা নিয়ে যাচ্ছিল। এই সমস্ত ঘটনা 'কেন' হচ্ছিল এটা তিলকা এবং সাঁওতালদের ভাবাচ্ছিল। কেনর উত্তর সাঁওতালরা খুঁজছিল। কোম্পানির এই কাজের ফলস্বরূপ দেখা দিল মন্বন্তর। যার ফলে দেখা দিল মহামন্বন্তর যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। মন্বন্তরের পরেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংল্যান্ডে পাঠায় মুনাফার ষাট হাজার পাউন্ড।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ছোটনাগপুরের সাঁওতালপল্লীতে কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। পরবর্তী সময়ে পুনরায় কোম্পানির গোলদার আদিবাসীদের কাছ থেকে চাল কেনার পরিকল্পনা করলে তিলকা তাকে সমঝে দেয় এবং প্রবল রাগে গর্জন করে ওঠে "গোলদারের হাত থেকে পয়সার থলিটা তীরের ফলায় তুলে আনে তিলকা। তবুন তিলকা ভীষণ ক্রোধে কেটে কেটে চাপা গর্জনে বলে, পয়সার থলি ঝমর ঝমর বাজিয়ে যদি কারেও লোভাচ্ছিস্ আর কোনো পাহাড়িয়া-জঙ্গালিয়ার মাথায় হাত বুলায়ে চাল কিনছিস আর-আজ মারলাম না, সেদিন মেরে দিব।"[৭] গর্জে উঠে তিলকা বুঝিয়ে দিল তারা কোম্পানির মনোভাবকে ভালো চোখে দেখছে না। আদিবাসীদের গ্রামে এই অধর্ম চলবে না। ভয় পেয়ে কোম্পানির গোলদার পয়সার থলি নিয়ে পালিয়ে যায়।

তিলকা পাহাড়িয়াদেরকেও বোঝায় যাতে কোম্পানির ফাঁদে পা না দেয়। কিন্তু বোঝানোর আগেই পাহাড়িয়ারা কোম্পানির পাতা জালে পা ফেলে দিয়েছিল। পাহাড়িয়ারা কোম্পানির চতুর মনোভাব বুঝতে পেরেছিল কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে এদিকে কোম্পানি সরকারও চুপ করে ছিলনা "কিন্তু মন্বন্তর শেষ হতে না হতে কোম্পানি সরকারের নজর পড়লো পাহাড়িয়াদের ওপর। না বিদ্রোহ নয়। মন্বন্তরের পরেও চাই দুনো রাজস্ব। সুবা বাংলার তিন ভাগ মানুষের একভাগ না খেয়ে মরেছে বাকি দুভাগ দিক।"[৮] কোম্পানি সরকার আদিবাসীদের জব্দ করার পরিকল্পনা করল। অফিসার ব্রুক একশো সেপাই নিয়ে রওনা দিল জঙ্গল এলাকার অভিমুখে। তিলকা-মনসা—গোপি-চাঁদোরা জানতে পেরে তীরের ফলায় শান দেয়। ইংরেজ কোম্পানির সেপাইদের সাথে লড়াই হয় তিলকা বাহিনীর। তিতাপানি নালার জল সেপাইদের রক্তে লাল হয়ে বয়ে যায়। পাহাড়িয়ারা গৌরব ফিরে পায়।

১৭৭২ সালে এসেছিল ক্যাপ্টেন ব্রুক। ১৭৭৩ সালে রাজমহল সুপারিনটেনডেন্ট হয়ে এলো আগাস্টাস ক্লিভল্যান্ড। ক্লিভল্যান্ড পাহাড়িয়াদের বন্ধু হয়ে উঠল। পাহাড়িয়াদের কাছে ক্লিভল্যান্ড হল চিলিমিলি সাহেব। ক্লিভল্যান্ড সাহেবের কথাতে ৪০০ পাহাড়িয়া কোম্পানি ফৌজে নাম লেখাল। এই বন্ধুত্বে সাঁওতালরা আদিবাসীদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা টের পেল। কোম্পানি আদিবাসীদের জন্য দামিন-ই-কোহ এর কথা বলল। কোম্পানির চতুর নীতিতে পাহাড়িয়া ছাড়া আর কোনো আদিবাসী সম্প্রদায়ের মন গললো না। ১৭৮০ সালে কোম্পানির জোর করে খাজনা আদায়ের জন্য সচেষ্ট হল। কোম্পানির এই পদক্ষেপে তিলকা রুখে দাঁড়াল, গ্রামে গ্রামে শালগিরা পাঠাল। কোন আদিবাসী খাজনা দিতে রাজি নয়। তিলকার ডাকে সবাই এগিয়ে গেল ঐক্যবদ্ধ হল। তিলকা হয়ে উঠলো বাবা তিলকা মাঝি। আদিবাসীদের পূজা-পরব, নাচ গান বন্ধ হল। সবাই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। কোম্পানির তহসিলদার পাইক বরকন্দাজ নিয়ে গ্রামে গ্রামে হানা দিতে লাগল "খাজনাই জুলুমের প্রথম বলি পিপল গ্রাম। জঙ্গল এলাকার সীমান্তের এ গ্রামে তহসিলদার ঢুকতে পায়নি। পরে যে সঙ্গে সে আনবে সেপাই, তা সাঁওতালরা বোঝেনি। কিন্তু সেপাই এসেছিল সঙ্গে ছিল তহসিলদার। দশ ঘর সাঁওতালের গ্রাম ঘিরে ফেলে তারা। গুলি ছুড়ে কুকুর মেরে গুলির ক্ষমতা দেখায়।"[৯]

বাবা তিলকা মাঝির ডাকে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও এগিয়ে এল। পুরুষেরা অস্ত্র নিয়ে জঙ্গল এলাকা রক্ষা করতে লাগল, আর মহিলারা গ্রাম, ঘর রক্ষা করতে লাগল, চাষের জন্য যাবতীয় কাজ কাঁধে তুলে নিল। তিলকা আদিবাসী যুবকদের লড়াইয়ের জন্য তৈরি করতে লাগল। তারা তীরের ফলায় শান দেয়, বাঁটুল ছোঁড়ার হাত ঠিক করে। হারা, মধু, ত্রিভুবন, কেশর ধানুকীরা তিলকার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়। ক্লিভল্যান্ড সাহেব আদিবাসীদের একরোখা মনোভাবের সামনে বারে বারে মার খায়। সাঁওতালদের হুলের সামনে দাঁড়াতে না

পেরে বারেবারে যুদ্ধের কৌশল পাল্টায়। ক্লিভল্যান্ড সাহেব পুনরায় ফৌজ নিয়ে তিতাপানির চরে পৌঁছয়। ফৌজের সাহেবদের দেখেও তিলকারা পিছু হটে না। সাহেবদের বন্দুকের গুলিতে ওরা ভয় পায় না "তিলকা বলে, পাথরের আড়ালে বসে যা তির মেরে। ওরা ছুঁড়বে গুলি। গুলি মেরে নদীর উজানে যা। হারা। তোরা থাক জঙ্গালের ধারে। বন্দুক কত রে। মারবে অনেক। মারুক। জিত আমাদের। নয়তো ইলাকা গেল, আবাদ গেল, সমাজ গেল। লে, চেঁচা সবাই একসঙ্গে। হুল্-হু-ল্।"[১০] শুরু হলো বন্দুকের সাথে তীরের লড়াই। আঁধার ভেদ করে বন্দুকের গর্জন শোনা যায়। আঁধারেই বন্দুকের গর্জন লক্ষ্য করে ছুটে চলে তীর। তিলকার কথা মত হারা, মধু, তিভুবন, কেশর ধানুকী লোক নিয়ে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যায়। বন্দুকের তীব্র গর্জনের সামনে তিলকারা আষাঢ়িয়া ঢলের মতো নেমে আসে। চিলিমিলি সাহেব শিঙা তুলে তিলকা মুর্মুকে বারে বারে ডাকতে থাকে। তিলকা সামনে এগিয়ে যাওয়ার আগে ফৌজের লোকেদের ফিরে যেতে বলে। কারণ ফৌজের সৈন্যরা জঙ্গাল এলাকার গ্রামে প্রবেশ করে নিরীহ মানুষ মেরেছে, ঘর জ্বালিয়েছে। তিলকা সামনে এগোতেই ক্লিভল্যান্ড বন্দুক তুলে নেয়। তিলকার গুলতি থেকেও বাঁটুল ছুটে যায় পর পর। ক্লিভল্যান্ড আহত হয়, ছত্রভঙ্গ হয় কোম্পানি ফৌজ। ১৭৮৪ সালের ১৩ই জানুয়ারি অগাস্ট ক্লিভল্যান্ডের (চিলিমিলি সাহেব) মৃত্যু হয়।

আদিবাসীরা ভেবেছিল কোম্পানি পিছু হটবে। কিন্তু বাস্তবে তা হল না। ভাগলপুরে নতুন কালেক্টর ঘোষণা সাঁওতাল দেখলেই গুলি করতে হবে। কারণ সাঁওতাল মাত্রই বিদ্রোহী। কোম্পানি তিলকাকে ধরিয়ে দেওয়ার ঘোষণা করল। তিলকা মাঝি আবার কোমর বেঁধে কোম্পানির বিরুদ্ধে তীর-ধনুক নিয়ে রুখে দাঁড়াল। তিলকপুর জঙ্গালে বন্দুকের বিরুদ্ধে আবার তীরের সম্মুখ সমর হল। তিলকা ধরা পড়ল ফৌজের হাতে। আর কেউ যাতে বাবা তিলকা মাঝি হয়ে ওঠার সাহস না পায় তাই ঘোড়ার পায়ে বেঁধে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হল। তিলকার রক্তে কৃষ্ণভারত লাল হয়ে উঠল "ঘোড়ার পায়ে বাঁধা তিলকা। ঘোড়া ছুটছে, তিলকার শরীর ছেঁচড়ে যাচ্ছে। নেই, চেতনা নেই। চেতনা আসছে যাচ্ছে। ঘোড়া থামল।"[১১]

ভাগলপুরের বটগাছে বাবা তিলকা মাঝির রক্তাক্ত শরীর ফাঁসিতে ঝোলানো হল। সাল ১৭৮৫।

মহেশ্বতা দেবীর লেখা 'শালগিরার ডাকে' ছোটগল্পে ইতিহাসের গর্ভে চাপা পড়ে যাওয়া আদিবাসী যুবকের বীরত্বের ছবি পাই। যে যুবক ব্রিটিশ কোম্পানির জয়ের পথে বাধা হয়ে বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। কোম্পানির আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে তার অস্ত্র ছিল বাঁটুল গুলতী, তীর-ধনুক এবং সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মনোভাব। বাবা তিলকা মাঝির নাম কোম্পানির কাছে ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছিল। সিধু-কানুর হুলের ভিত্তিভূমি রেখে গেলো বাবা তিলকা মাঝির হুল। স্বাধীন রাজ্যের স্বপ্ন এঁকে গেল বাবা তিলকা মাঝির হুল।

মহাশ্বেতা দেবী তিলকা মাঝির বীরগাথা তুলে ধরার পাশাপাশি আদিবাসীদের রীতিনীতিকেও যথাযথভাবে তুলে এনেছেন। আদিবাসীদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা, ল-বির সেন্দ্রার কথাও উঠে এসেছে যার যোগ রয়েছে শিকার উৎসবের সাথে। উঠে এসেছে সাঁওতাল সমাজের বাঁধনের কথা "তোকে এখন জানতে হবে এসব। সমাজের বাঁধন, সমাজের শাসন, সমাজের রীতিকরণ। কাছে থাকি, দূরে থাকি, সকল সাঁওতাল এক সমাজের লোক। সকল হড়, মানুষের - এক সমাজ, গাঁওতা। যখন তুই সাঁওতাল রক্তে জন্মালি, তখন তোর সমাজ এত বড়টা। মনে রাখিস।"[১২] নাগরিক সভ্যতা থেকে শত যোজন দূরে থাকা একটি সভ্যতাকে, তার সমাজ ব্যবস্থাকে রীতি-নীতি লোকাচারকে যথাযথ ভাবে তুলে আনা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছেন। আদিবাসী জীবনকে, তাদের যাপনকে জানার জন্য তিনি বারে বারে ছুটে গেছেন আদিবাসী মানুষের কাছে। দীর্ঘদিন তাদের সাথে থেকেছেন। আদিবাসীদের গানে, দেওয়াল চিত্রে যে ইতিহাস রয়ে গেছে সেই ইতিহাসকে তিনি তুলে এনেছেন সাহিত্যের পাতায়।

আকরগ্রন্থ

১। দেবী মহাশ্বেতা, শালগিরার ডাকে, রচনা সমগ্র ১১, দে'জ ২০০৩, পৃ. ৪১১।

২। তদেব, পৃ. ৪২৮।

৩। তদেব, পৃ. ৪২২।

৪। তদেব, পৃ. ৪২৫।

৫। তদেব, পৃ. ৪২৪।

৬। তদেব, পৃ. ৪৩০।

৭। তদেব, পৃ. ৪৩২।

৮। তদেব, পৃ, ৪৩৭।

৯। তদেব, পৃ. ৪৪৮।

১০। তদেব, পৃ. ৪৫৮।

১১। তদেব, পৃ. ৪৬২।

১২। তদেব, পৃ. ৪২৪।

ISSN : 0976-9463
Issue 26, Vol. 42

তরুএকলব্য ৪২

UGC Approved Peer-Reviewed Research Journal on Arts and Humanities

বাংলা সাহিত্যে সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন

বিশেষ সংখ্যা

দি গৌরী কালচারাল
এন্ড
এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন

TABU EKALAVYA

UGC Approved International Peer-Reviewed (Refereed)
Research Journal on Arts & Humanities

ISSUE 26, Vol. 42 ● First Edition : April - June 2020

Second Edition : January 2021

Third Edition : August 2021

ISSN : **0976-9463**

তৃতীয় সংস্করণ : ২৯ শ্রাবণ/১৫ আগস্ট ২০২১

TABU EKALAVYA

Chief Advisor	:	**Swami Shastrajnananda**
		Selina Hossin
		Ramkumar Mukhopadhyay
		Soma Bandyopadhyay
		Sadhan Chattopadhyay
President	:	**Biplab Majee**
Vice-President	:	**Tapan Mandal**
Executive Editor	:	**Sushil Saha**
Editor	:	**Debarati Mallik**
Joint Editor	:	**Tapas Pal**
Editor-in-Chief	:	**Dipankar Mallik**
e-mail	:	**tobuekalabya@gmail.com / tabuekalavya@gmail.com**
Website	:	**www.tabuekalabya.in**
facebook	:	তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা
গ্রুপ	:	তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : দে'জ, দিয়া, দে বুক স্টোর (দীপু), পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, পাতাবাহার

মূল্য : ৭৫০ টাকা

প্রফুল্ল রায়ের 'রক্তকমল' : ভাষা আন্দোলনের দলিল ৫৬২
মাসকুরা খাতুন

◆ নাটক বিষয়ক প্রবন্ধ ৫৬৮-৬৮৯

দেশভাগ ও বাংলা নাটক ৫৬৮
অপূর্ব কুমার দে
উনিশ শতক : বিধবা বিবাহ আন্দোলন ও বাংলা নাটক ৫৭৩
তপন মণ্ডল
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা' : দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ৫৮৬
অমিতাভ বিশ্বাস
উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী উচ্চারণ ও বাংলা নাটক ৫৯৩
মহ. জিয়াউল হক
'টিনের তলোয়ার' : প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের নাটক ৬০০
সুমন গরাই
বাংলা নাটকে সমকালীন আন্দোলনের প্রতিফলন ৬০৬
রচনা রায়
দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন ৬১৭
মৌমিতা মল্লিক
মুনীর চৌধুরীর 'কবর' : দেশভাগ ও ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ৬২২
দেবরাজ হাওলাদার
বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে কৃষক সমাজ ৬৩৩
পাপিয়া সামন্ত
রাজনৈতিক আন্দোলনের দুই মুখ : প্রসঙ্গ উৎপল দত্তের দুটি একাঙ্ক ৬৪০
চন্দন কুমার সাউ
ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাত : নাটক ও প্রহসনে বিধবা বিবাহ আইনের প্রতিক্রিয়া ও বঙ্গনারী ৬৪৬
নীলাঞ্জনা পাত্র
'দেবীগর্জন' : কৃষক আন্দলনের দর্পণে ৬৫৪
সায়নী কুণ্ডু
'নতুন ইহুদী' : উদ্‌বাস্তুদের আর্তনাদ ৬৫৮
সাবির মণ্ডল
উনিশ শতকের নারীশিক্ষার প্রতিফলন : বিহারীলালের 'খণ্ড-প্রলয়' ৬৬৩
অসীমা হালদার
গণনাট্য আন্দোলন ও বিজন ভট্টাচার্যের নাটক : একটি পর্যালোচনা ৬৬৭
সেখ আজাহারউদ্দিন

উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী উচ্চারণ ও বাংলা নাটক

মহ. জিয়াউল হক

জাতীয়তাবাদী ভাবনা বর্তমানে মানুষের জীবনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। এখন মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচিগুলি জাতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্বাহ হয়। দেশবাসীর মধ্যে আত্মিক যোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের ভূমিকা অপরিহার্য। ভারতবর্ষে ভাষা, ধর্ম, জীবনযাপনপ্রণালী প্রভৃতি ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তবুও আমরা একবাক্যে স্বীকার করি যে, আমরা ভারতীয়। এই অভিন্নের ধারণা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বজায় রেখেছে। কিন্তু ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে ধর্ম ও রাজ্যভিত্তিক বিচ্ছিন্নতা গড়ে ওঠার প্রবণতা আজও আমাদের নানাভাবে বিভ্রান্ত করে। তাই উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদের দিকে একবার ফিরে দেখা দরকার।

উনিশ শতকে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করেন তাতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভাবধারা প্রকাশের সুযোগ থাকলেও তাঁরা ব্রিটিশ-বিরোধিতা করতে পারেননি। বরং ইংরেজ শাসনকে মুক্তির প্রতীক মনে করেছিলেন এক শ্রেণির বাঙালি। নিজ সমাজের স্বার্থে তাঁরা ইংরেজদের সহযোগিতা করে গেছেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর শিক্ষিত হিন্দুর রাজনৈতিক বিশ্বাস সম্পর্কে সগর্বে বলেছেন—

> If we were to be asked– what Government would you prefer, English or any other ? We would one and all reply, English by all means, any even in preference to the Hindoo Government.[১]

শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে শিক্ষিত বাঙালির মন থেকে ব্রিটিশ-মোহ ক্রমশ দূর হয়। সরকারি নিয়মনীতির প্রতিবন্ধকতা, চাকরিতে সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে তাঁদের মনে ক্ষোভ জমা হতে থাকে। তখন তাঁরা বিভিন্ন সভা-সমিতি গঠন করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু দেখেন সরকার অতি প্রয়োজনীয় দাবিগুলিও মেনে নিচ্ছেন না। তাই সমকালে প্রবলভাবে আহত হয়ে তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতীতচারণা করেছেন। বিদেশি ঐতিহাসিকদের গবেষণালব্ধ তথ্যের সাহায্যে তাঁরা জানতে পারেন যে, অতীতে ভারতবর্ষ ছিল এক সমৃদ্ধ দেশ।

একের পর এক বিদেশি শাসকের কবলে পড়ে সেই ঐতিহ্য ক্রমশ ম্লান হয়ে পড়েছে। এই ভাবনার উপর নির্ভর করে তাঁরা হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য সংগঠিত হওয়ার ডাক দেন। কিন্তু তাঁদের কাছে অতীত মানে শুধুমাত্র হিন্দু-আর্য প্রভাবিত। অহিন্দু ভারতীয়দের তাঁরা অনাত্মীয় ভাবতে থাকেন। মুসলমানদের চিহ্নিত করেন বহিঃশত্রু হিসেবে। ফলত জাতীয়তাবাদের নামে

তাঁরা যা প্রচার করতে থাকেন তাতে ভারতীয়ত্ব আর হিন্দুত্ব অভিন্ন বলে প্রতিপন্ন হয়।

অন্যদিকে, মুসলমানেরাও বিগত দিনের শাসকের জাতি হিসাবে গর্ববোধ, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি বিরূপতা এবং ইংরেজ শাসকদের বিমাতৃসুলভ আচরণে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিলেন। তাঁদের এক বৃহৎ অংশ যদি যোগ দিতে পারতেন তাহলে বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে জাতীয়তাবাদের হিন্দু ভাব কিছুটা দূর হতে পারত। এরপর সাতের দশক থেকে মুসলমানদের মধ্যেও নবচেতনা জাগ্রত হতে শুরু করে। শিক্ষিত মুসলমানেরা তখন পৃথক সভা-সমিতি স্থাপন করে স্বসমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সরকারি চাকরি ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর তাঁদের বিরোধের মূলে ইন্ধন জোগাতে থাকে বিদেশি শাসকেরা। ফলত অখণ্ড রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও উনিশ শতকের শেষদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারাটি দুটি স্বতন্ত্র খাতে বইতে শুরু করে।

সাহিত্যে জাতীয়তাবাদী উচ্চারণের ক্ষেত্রেও বাঙালি দ্বিধা-দ্বন্দ্বাকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। পরাধীনতার জ্বালা তাঁদের মনে অস্বস্তি সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশা জনিত কারণে তাঁরাও কেউ কেউ স্বতন্ত্র জাতি গঠনের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু সরাসরি সেকথা বলতে পারেননি। কখনও ভয়ে আবার কখনও ভক্তিতে গদগদ হয়ে ব্রিটিশের জয়গান গেয়েছেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেছিলেন, 'দেশের কুকুর ধরি,/বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'।[২] ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলে তিনিই আবার আবেগে আপ্লুত হয়ে লিখেছেন—

তুমি মাতা ভিক্টোরিয়া থাক বিলেতে
আমরা মা সব তোমার অধীন, দীন চিরদিন,
শুভদিন দিন মা ভারতে।[৩]

এরকম দোলাচল সমকালে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের রচনায় দেখা যায়। একই লেখকের বিভিন্ন রচনা পাশাপাশি রেখে পড়লে বিষয়টি ভালো বোঝা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৮৭,১৮৯২) প্রভৃতি রচনায় ব্রিটিশ শাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে বিদ্রুপ ও সমালোচনা করেছেন। আবার 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) উপন্যাসে দেখা যায়, সত্যানন্দ বলেছেন—"আমরা রাজ্য চাহি না-কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদিগকে স্ববংশে নিপাত করিতে চাহি।"[৪]

মুসলমান লেখকেরাও সমকালীন যুগ-পরিবেশের নানাবিধ দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হয়েছেন। ভাব ও ভাষাগত দ্বন্দ্ব আগে থেকেই ছিল। তার ওপর স্বজাতি ও বিজাতির মধ্যে ধর্মীয় বাদ-বিসম্বাদ, সামাজিক বিরোধ এবং সাংস্কৃতিক সংঘাত তাঁদের নানাভাবে দিগভ্রান্ত করেছে। তাঁরা কখনও মিশ্র ভাষারীতির কাব্যচর্চা করেছেন; আবার কখনও ইসলামীয় সংস্কৃতির আধারে কাব্যচর্চা করে পৃথক স্বাজাত্যবোধ উদ্দীপিত করতে চেয়েছেন। তবে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে এটাই একমাত্র সুর ছিল না। মীর মশারফ হোসেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতির ধারক হয়েও উদার মানবতাবাদী আদর্শে জাতীয়তাবাদকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন।

শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে নাটক ভারতের জাতীয়তাবাদ উদ্দীপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই সময়পর্বে প্রায় অর্ধশত নাট্যকার জাতীয়তাবাদী ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু দু-একজন ছাড়া অধিকাংশ নাট্যকারের পরিচিতি সাহিত্যের ছাত্রের বাইরে অত্যন্ত ক্ষীণ। তবে মনে রাখা দরকার, বাঙালির জাতীয় মানসিকতার জীবন্ত দলিল হিসাবে তাঁদের

নাটকগুলিরও গুরুত্ব রয়েছে। সেই সময় বাঙালি নাট্যকারেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়েছিলেন বিগত ইতিহাসের দ্বারা। সেই ইতিহাসে তাঁরা হিন্দু জাতির অতীত গৌরব এবং বিদেশি শাসনের কবলে পড়ে সেই গরিমা ম্লান হয়ে যাওয়া বিষণ্ণ নেত্রে লক্ষ করেছিলেন। জেমস টড-এর 'Annals and Antiquities of Rajasthan' (১৮২৯, ১৮৩২) গ্রন্থটি এক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তাছাড়া তথ্যের স্বল্পতাও ছিল। তাই সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক সে সময় রচিত হয়নি। সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি অবলম্বনেও বেশ কিছু নাটক রচিত হয়েছে। সেগুলির কোনও কোনোটিতে জাতির তৎকালীন দুরবস্থার জন্য বিলাপ এবং শাসকের করুণা ভিক্ষা করা হয়েছে। আবার কয়েকটি নাটকে সরাসরি ব্রিটিশ-বিরোধিতাকে তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলা নাটকে জাতীয়তার প্রথম প্রকাশ লক্ষ করা যায় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকে। এই নাটকের ইংরেজ-বিদ্বেষ ও জাতীয়তাবাদী ভাবনা পরবর্তীকালের নাট্যকারদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। বাংলার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর দ্বারোদঘাটন করা হয় 'নীলদর্পণ'-এর অভিনয়ের মাধ্যমে। সেদিক থেকেও নাটকটি আলাদা তাৎপর্য বহন করে। মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটকে ভীমসিংহের স্বদেশ চেতনায় ভবিষ্যৎ ভারতের স্বপ্ন অঙ্কিত হয়েছে। এখানে দেশের পরাধীনতার জন্য মর্মবেদনা এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা নাটকে জাতীয়তাবাদের যথার্থ প্রতিফলন ঘটে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর। 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পর 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ যেসব নাটক অভিনীত হয়েছিল তা দেখে তৃপ্ত হতে পারেননি নাট্যরসিক দর্শকেরা। জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের আদর্শ অনুযায়ী নাটকের অভিনয় দেখতে না পেয়ে তাঁরা আশাহত হন এবং নাটকের কর্ণধারদের এ বিষয়ে সতর্ক করেন। 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় এ সম্পর্কে লেখা হয়—

> জাতীয় নাট্যসমাজ' এই নামটি অতি উচ্চ! এই নাম ধারণ করাতে তাঁহাদের নিকট কেবল আমোদ ব্যতীত আরও যে উচ্চ আশা আছে এবং তাঁহারা যে সে আশা পূরণের আশা দিয়াছিলেন, এখন কি তাহা ভুলিয়া গেলেন?[৫]

পত্রিকায় এমন প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও সমালোচনার নির্ভীক ভঙ্গিটি সত্যই প্রশংসনীয়। এরপর থেকে থিয়েটার কর্তৃপক্ষ নাটকের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন আনতে চাইলেন। কিন্তু সে ধরনের নাটকের তখন একান্ত অভাব। বাংলা নাটককে এই দীনতা থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর অন্যতম অভিনেতা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখে ফেললেন 'ভারতমাতা' (১৮৭৩) নামক এক ক্ষুদ্র রূপক নাটক। নাটকটি পরিকল্পনার মূলে জাতীয় চেতনা অন্যতম প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে তা শুরুতেই সূত্রধারের উক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে—

> ভারত-ভূমির ও ভারত সন্তানগণের বর্তমান দুরবস্থা প্রদর্শনই 'ভারতমাতার' উদ্দেশ্য। যদ্যপি সমাগত সুধী মণ্ডলীর একজনও এই অভিনয় দর্শনে ভারতমাতার দুঃখ দুর করতে একদিনও যত্ন পান, তাহা হইলেই আমার ও গ্রন্থকর্তার শ্রম সফল।[৬]

এই নাটকে ভারতমাতা দেশের দুরবস্থা নিরসনের আশায় তাঁর সন্তানদের জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু অত্যাচারে-অনশনে সন্তানেরা শক্তিহীন। তাই তাঁরা মায়ের পরামর্শে মহারানি ভিক্টোরিয়ার কৃপা প্রার্থনা করেছেন। পরিশেষে ধৈর্য, সাহস ও একতা এই তিনটি চরিত্রের মাধ্যমে ভারতবাসীর

মুক্তিপথের দিশা দেখানো হয়েছে। এই নাটকটির অভিনয় সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কিরণচন্দ্র 'ভারতে যবন' (১৮৭৪) নামক আর একটি 'মাস্ক' রচনা করেন। এই নাটকে 'প্রজাপীড়ক' যবন শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারত সন্তানের উদ্দীপিত ভাষণ ও সাহসিক সংগ্রাম দেশবাসীকে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার ব্রতে সামিল হতে উৎসাহিত করে। সমকালীন জাতীয়তাবাদী নাট্যকারদের উপর নাটক দুটির যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। এই ক্ষুদ্র রূপক দুটি যখন পূর্ণাঙ্গ নাটকের কাছাকাছি সমাদর লাভ করতে সক্ষম হলো তখন তা অনুসরণ করতে চেষ্টা করলেন অনেকে। হারাণচন্দ্র ঘোষের 'ভারত দুঃখিনী' (১৮৭৫); কুঞ্জবিহারী বসুর 'ভারত অধীন?' (১৮৭৪), 'ধর্মক্ষেত্র' (১৮৭৬); নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এই কি সেই ভারত?' (১৮৮৬) প্রভৃতি নাটক এই আদর্শ অনুসরণে লিখিত। শিক্ষিত বাঙালির জাতীয় ভাব উদ্দীপনাকে অবলম্বন করে প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন হরলাল রায়। তিনি ছিলেন একাধারে আদর্শ শিক্ষক, শিক্ষা প্রসারক, সমাজসেবী এবং নাট্যকার। তাঁর 'হেমলতা' (১৮৭৩) এবং 'বঙ্গের সুখাবসান' (১৮৭৪) নাটক দুটিতে জাতীয়তাবাদ উদ্দীপনের চেষ্টা দেখা যায়। প্রথমটি মধ্যযুগের রাজপুতানার কল্পিত ইতিহাসের প্রেক্ষিতে রচিত। চিতোরের সাহসী সৈনিক সত্যসখার উক্তিতে বীরত্ব ও মহাপ্রাণতার আদর্শ পরিলক্ষিত হয়েছে—

> এই স্বর্গতুল্য ভারতভূমিকে যবনেরা অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ করবে; তা মনে করাই মৃত্যুর অধিক। ভারতভূমি পরাধীন হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক ভারত সন্তান প্রাণত্যাগ করুক।[৭]

'বঙ্গের সুখাবসান' নাটকটি বক্তিয়ার খিলজির বাংলা জয়ের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। এই নাটকে তিনি 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) উপন্যাসের মতো রাজা লক্ষ্মণ সেনের 'ভীরুতা' ও 'কাপুরুষতা'-র অপবাদ খণ্ডন করে তাঁকে জাতীয় বীর হিসাবে অঙ্কন করেছেন। রাজার বীর ভ্রাতুষ্পুত্র বিরাট সেন রাজ্যের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার কাজে জাতিকে সামিল করতে না পেরে সখেদে বলেছেন—"কোটি বাঙালির মধ্যে দশজন স্বদেশ উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত নয়। প্রাণের এত মমতা? দুর্দিনের নিশ্বাস প্রশ্বাস কি এতো বড়ো হলো, আর স্বাধীনতা কিছুই নয়। বাঙালি কি জীবিত আছে?"[৮]

প্রমথনাথ মিত্রের 'নগনলিনী' (১৮৭৪); বিপিনবিহারী ঘোষালের 'বঙ্গের পুনরুদ্ধার' (১৮৭৪); উমেশচন্দ্র গুপ্তের 'হেমনলিনী' (১৮৭৫), 'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক' (১৮৭৫) প্রভৃতি নাটকেও হিন্দু গৌরব ও বীরত্বের উদ্দীপিত দৃশ্যের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী ভাব উদ্রেকের চেষ্টা করা হয়েছে। ইতিহাসের প্রেক্ষিতে নাটক রচনা করে ভারতের অতীত ঐতিহ্য ও বীরগাথাকে তুলে ধরে দর্শক-পাঠকের মনে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করতে অধিক সমর্থ হয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। হিন্দুমেলার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং ঠাকুরবাড়ির গঠনমূলক পরিবেশে বড়ো হওয়ার সুবাদে তিনি অকৃত্রিম দেশানুরাগী হয়ে ওঠেন। তিনি নিজেই লিখেছেন—

> হিন্দু মেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত কী উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশ প্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনি কীর্তন করিলে হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কটকে থাকিতে থাকিতেই আমি 'পুরুবিক্রম' নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম।[৯]

'পুরুবিক্রম' নাটকটি গ্রিক সম্রাট সেকেন্দারের ভারত আক্রমণের পটভূমিতে রচিত। বিদেশি আক্রমণে দেশের জাতীয় জীবনে যে কলঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করতে কুলুপর্বতের রানি ঐলবিলার

উদ্যোগে দেশের রাজকুমারেরা একত্রিত হয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' গানটি নাটকের আবহ তৈরিতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে গীত এই গানটি এক সময় শ্রোতাদের মধ্যে দেশপ্রেমের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। 'বঙ্গদর্শন', 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' প্রভৃতি পত্রিকায় নাটকটির কাহিনি, চরিত্র, বীর রস, মার্জিত রুচি প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। নাটকটি এতো জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, এটি হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষায় অনুদিত হয় এবং রঙ্গালয়ের উদ্যোক্তারা অভিনয়ের জন্য সাদরে গ্রহণ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও উৎসাহিত হয়ে আরও তিনটি সমধর্মী নাটক রচনা করেন—'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতি' (১৮৭৯) এবং 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২)। এই নাটকগুলিতে মধ্যযুগের ইতিহাস অবলম্বনে হিন্দু রাজাদের বীরত্ব ও মহাপ্রাণতার আদর্শ তুলে ধরে জাতীয়তাবাদ উদ্দীপনের চেষ্টা করা হয়েছে। আবার বৃহত্তর মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'অশ্রুমতী' নাটকে সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের সহজ মিলনকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অবলম্বন করে যে কয়েকটি জাতীয়তাবাদী নাটক রচিত হয়েছিল তার মধ্যে মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩) নাটকটির কথা প্রথমেই মনে পড়ে। এই নাটকে জমিদার শ্রেণির অত্যাচারের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হায়ওয়ান আলীর পাশবিক বৃত্তির হৃদয়-বিদারক ঘটনা তুলে ধরেছেন এবং পাঠককে শাসকের অনুগ্রহপুষ্ট জমিদারদের অত্যাচারের বিষয়ে সচেতন করেছেন। নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধার রক্ষকের ভক্ষক বৃত্তির কথা কাব্যাকারে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

হা ধর্ম্ম তোমার ধর্ম্ম লুকালো ভারতে;
জমিদার অত্যাচারে ডুবিল কলঙ্কে।[১০]

দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'দর্পণ' শিরোনামের অনুবর্তনে দুটি নাটক রচনা করেন—'চা-কর দর্পণ' (১২৮১) এবং 'জেল-দর্পণ' (১২৮২)। নীলকরদের মতোই চা-কর সাহেবরা আসামের দুর্গম চা বাগানে কুলি-কামিনদের ওপর যে জঘন্য অত্যাচার চালাত তা দেখানো হয়েছে 'চা-কর দর্পণ' নাটকে। শাসকের মদতে চা-কর সাহেবরা কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন তা জানা যায় সর্দার নিধুরামের উক্তিতে—"আমার সাহেবের মুঠোর ভেতর থানা পুলিশ। তুই জানিস আমার সাহেব যদি একটা ছেড়ে হাজারটা খুন করে, তাহলে আমার সাহেবের কিছু হবার যো নাই।"[১১]

আর 'জেল-দর্পণ'-এ ব্রিটিশ-কারাগারে ভারতীয় বন্দিদের উপর অমানবিক নির্যাতনের এক মর্মন্তুদ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই নাটকটি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ 'নীলদর্পণ' বা 'চা-কর দর্পণ' নাটকে অত্যাচারী হিসাবে নীলকর বা চা-কর সাহেবদের দেখানো হয়েছে। তাঁরা শাসক নন, ব্যবসায়ী মাত্র। আর এ নাটকে অত্যাচারীর ভূমিকায় দাঁড় করানো হয়েছে জেলকর্তা অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসকদের। জেলে কয়েদিদের দিয়ে ঘানি ঘোরানো, পাথর ভাঙানো ছাড়াও কারণে-অকারণে কত নির্মমভাবে অত্যাচার করা হতো তা এই নাটকে দেখানো হয়েছে। পরিশেষে পাগলের প্রলাপোক্তির ছলে নাট্যকার দর্শকদের জাতীয়তাবাদী ভাবধারা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

এই সময়ের নাটকে একটু ভিন্ন সুর শোনালেন উপেন্দ্রনাথ দাস। তাঁর নাটকের মূল কথা হলো ইংরেজ বিদ্বেষ। ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার, বিচারের নামে প্রহসন ইত্যাদি অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তাঁর 'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭৪) ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' (১৮৭৫) নাটকে। 'শরৎ-সরোজিনী'-তে জাতীয়তাবাদী ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে শরৎবাবুর মাধ্যমে।

তিনি মনে করেন, পরাধীন ভারতবাসীর একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত বিজাতীয় শাসনের উচ্ছেদ। সেজন্য প্রণয় নয়; দরকার দেশের অজ্ঞানান্ধকার দুর করা এবং দেশীয় কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন। অন্যদিকে, 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকে প্রণয়মূলক রোমান্টিকতা থাকলেও এটি জাতীয়তাবাদী ভাবনায় উদ্দীপিত। এই নাটকে হুগলির ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্রেন্ডেলের সঙ্গে সুরেন্দ্রের বিরোধ সমকালে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজ শাসকের অত্যাচারী-উচ্ছৃঙ্খল ও জাতিগর্বী রূপটি ফুটে উঠেছে ম্যাক্রেন্ডেলের উক্তিতে—

> নির্বোধ আমি বাইবেল চুম্বন করিয়া শপথ পূর্বক যাহা বলিব তাহার বিরুদ্ধে দুই শত বাঙালির সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না। এতকাল ইংরেজের রাজ্যে বাস করিয়া এই সামান্য জ্ঞান উপলব্ধি কর নাই?[১২]

ব্রিটিশ শাসকদের মনোভাব এই উক্তিতে প্রকাশিত। তাছাড়া বিচার ব্যবস্থার পক্ষপাতিত্ব, কারাগারে বন্দিবিদ্রোহ ইত্যাদি ঘটনা স্বদেশপ্রাণ বাঙালির মনেও বিজাতীয় ঘৃণা জাগিয়ে তোলে এবং তাদের ভীষণভাবে উদ্দীপিত করে। এছাড়াও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুইকোয়ার' (১৮৭৫), অমৃতলাল বসুর 'হীরকচূর্ণ' (১৮৭৫) প্রভৃতি নাটকে সমকালীন পরিস্থিতিকে তুলে ধরে জাতীয়তাবাদ উদ্দীপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষদিকে শিক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে প্রেরণা অনুভব করেন তা ছিল নানা বৈপরীত্যে কণ্টকিত। তাঁরা স্বসমাজের স্বার্থে ব্রিটিশদের সঙ্গে ভাবালাপ বজায় রেখে চলেছিলেন। কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির দুরবস্থা নিরসনের কোনও উপায় তাঁরা অবলম্বন করেননি। ধর্ম ও সম্প্রদায়গত ভিন্নতাও অনেকক্ষেত্রে বিরোধের পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিশেষত নাটকে যে জাতীয়তাবাদী উচ্চারণ শোনা যায় তা কিছুটা স্বতন্ত্র পথের দিশা দেখিয়েছে। কারণ ব্রিটিশ সরকারের অমানবিক শাসন-শোষণ এবং তা চিরকাল কায়েম রাখার চেষ্টায় নিত্য-নতুন আইন প্রণয়ন, দেশীয় মানুষের কণ্ঠরোধ, জাতি-বিদ্বেষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে বাংলা নাটকে। আর সাধারণ রঙ্গালয়ে নাটকগুলি অভিনীত হওয়ার ফলে দর্শকের মধ্যেও জাতীয়তার ভাবধারা সঞ্চারিত হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদ ও সাময়িকপত্রে নাটকগুলির সপ্রশংস সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-য় 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে—

> যিনি বেঙ্গল থিয়েটারে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছেন, তিনি দৃঢ়রূপে জানিতে পারিয়াছেন যে এদেশের ম্যাজিস্ট্রেটরা কীরূপ অখণ্ড প্রবল প্রতাপান্বিত, স্টীফেন সাহেবের নতুন দণ্ডবিধি আইন তাহাদের হস্তে কি ভয়ানক যন্ত্র, কারাগারবাসীরা কত কৃপার পাত্র এবং তাহাদের উপর গভর্নমেন্ট কত নিপীড়ন করেন। যাঁহারা এইরূপ গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহারা দেশের পরোপকারী এবং যাঁহারা দেশহিতৈষী তাঁহাদের সকলের এইরূপ গ্রন্থকর্তাকে উৎসাহ প্রদান করা উচিত।[১৩]

এরকম উক্তি থেকে বোঝা যায়, নাটকগুলি সমকালীন জনমতকে কতখানি প্রভাবিত ও উদ্দীপিত করেছিল। বাংলা নাটকের এই গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ব্রিটিশ সরকারকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। তাই নাটকের কণ্ঠরোধ করার জন্য সরকার 'নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন' (১৮৭৬) জারি করেন।

সরকারি বিধিনিষেধের চাপে প্রায় তিন দশক ধরে এ ধরনের নাটক রচনা ও অভিনয় বন্ধ থাকে। তারপর বিশ শতকের গোঁড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জাতির মনে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তখন সরকারি আইন উপেক্ষা করে বাংলা ভাষায় রচিত হয় একের পর এক জাতীয়তাবাদী

নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখের জাতীয়তাবাদী নাটকগুলি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান করে নেয়। আর তাঁদের সেইসব নাটকের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী নাটকগুলি। যুগের প্রভাব স্বীকার করে নিয়ে উনিশ শতকে যে ইতিহাসাশ্রিত ও সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলি অবলম্বনে নাটকগুলি রচিত হয়েছিল তা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। তাই একুশ শতকেও এ ধরনের আলোচনা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয়ত্ব বোধকে সুদৃঢ় করতে বিশেষভাবে সহায়তা করবে।

উৎসের সন্ধানে

১. প্রসন্নকুমার ঠাকুর : 'ইন্ডিয়া গেজেট', ৪ জুলাই, ১৮৩১
২. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : 'স্বদেশ', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব', ১২৯২; পৃ. ২৮৭
৩. তদেব : 'নীলকর', দ্বিতীয় গীত, পৃ. ১০৪
৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'আনন্দমঠ', শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৩৪৫, পৃ. ৬০
৫. মনোমোহন বসু সম্পাদিত : 'মধ্যস্থ'; ৬ মাঘ, ১২৭৯
৬. কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : 'ভারতমাতা', ১৮৭৩ খ্রি., পৃ. ১-২
৭. হরলাল রায় : 'হেমলতা', নির্মলকুমার নাগ সম্পাদিত, 'হরলাল রায়ের নাটক সংগ্রহ'- ১৪১৯ খ্রি., পৃ. ৭৯-৮০
৮. তদেব : পৃ. ২৫২
৯. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', সুবর্ণরেখা-২০০২, পৃ. ৪৬
১০. মীর মশাররফ হোসেন, 'জমিদার দর্পণ'; 'মীর মশাররফ হোসেন নাটক সমগ্র'; ২০১২, পৃ. ৯১
১১. দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় : 'চা-কর দর্পণ', ১২৮১, পৃ. ৫০
১২. উপেন্দ্রনাথ দাস : 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী', প্রথম নাট্য অকাদেমি সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ. ১৬
১৩. শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত : 'অমৃতবাজার পত্রিকা', ২১ ফাল্গুন, ১২৮১

ঈদ উৎসব ও মহিষাসুর স্মরণ সংখ্যা ১৪২৫

উদার আকাশ

ISSN 2320-3498

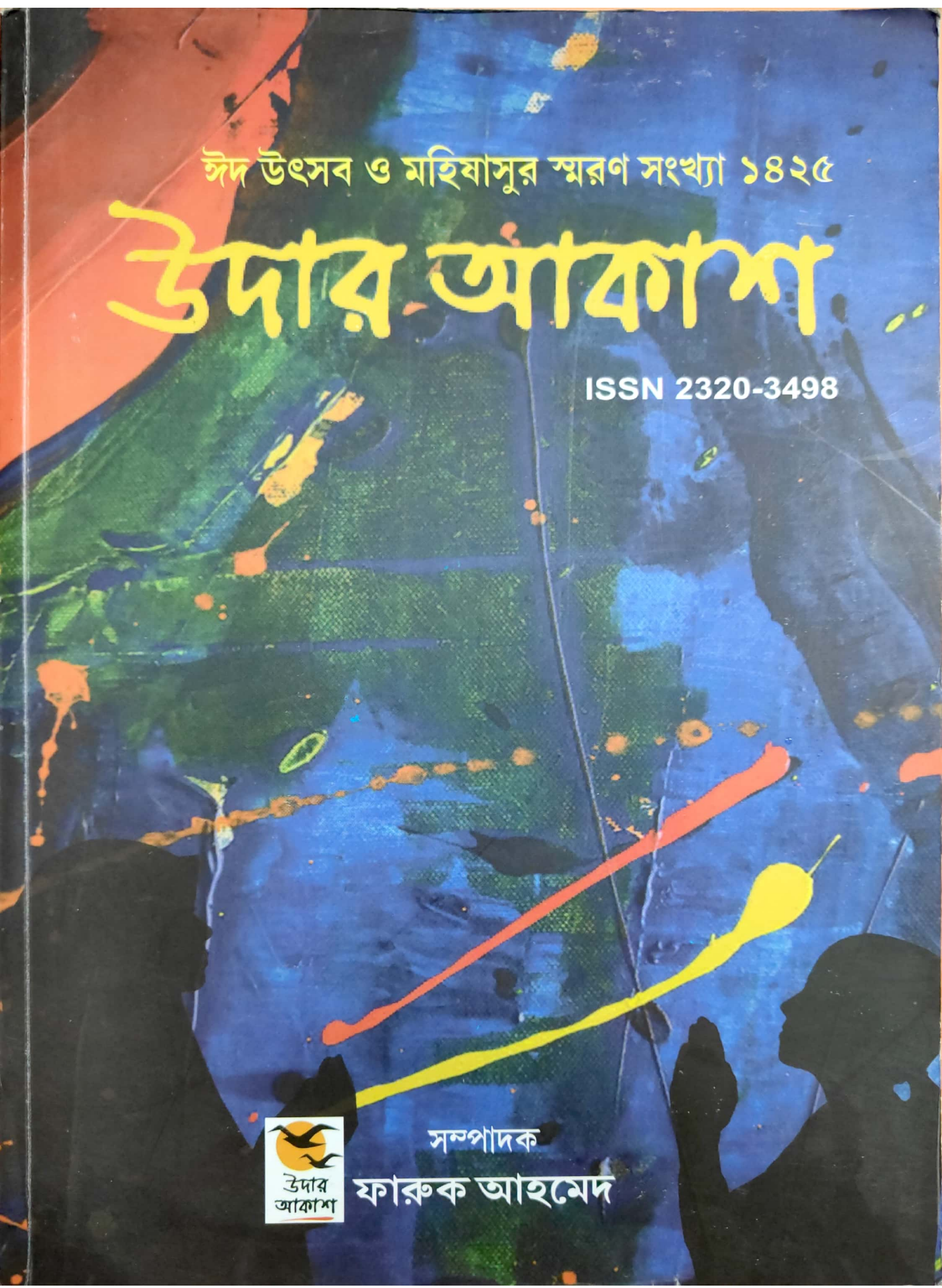

সম্পাদক

ফারুক আহমেদ

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

ঈদ উৎসব ও মহিষাসুর স্মরণ সংখ্যা ১৪২৫

প্রবন্ধ

তরুণ মুখোপাধ্যায়
হজরত মহম্মদ (সা.): তিন কবির চোখে □ ১৫

গৌতম রায়
মহিষমর্দিনী বনাম মহিষাসুরপূজা □ ১৭

একরামূল হক শেখ
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেম সম্প্রদায় : এক প্রস্তাবনা □ ১৯

সুখেন্দু বিকাশ মৈত্র
জীবনের জন্য নদী □ ৬৪

ত্রিসপ্ত প্রদীপ
পরশুরাম : রামায়ণ কাহিনির রসময় স্রষ্টা □ ৭৬

মিরাজুল ইসলাম
মেঠো সুরের গান 'খন' □ ৮২

সাইফুল্লা
বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি: প্রসঙ্গ কথা ও ব্যক্তিগত বীক্ষা □ ৮৬

শুভেন্দু মণ্ডল
নদী-ভাঙনের সংরূপ ঘনশ্যাম চৌধুরীর অবগাহন □ ১২৭

শান্তনু প্রধান
স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে নগরায়ণবাদের স্বরূপ □ ১৩৭

মহঃ জিয়াউল হক
ভারতের জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনে
দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের জেল-দর্পণ □ ১৫১

সুবীর কুমার সেন
বিনয়ের কবিতায় সুর-রিয়ালিস্ট সংবেদন
জীবনানন্দের উত্তরাধিকার □ ১৫৮

Scanned with CamScanner

ভারতের জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনে দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের জেল-দর্পণ

মহঃ জিয়াউল হক

ভারতের জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশে অবিভক্ত বাংলা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার সংস্পর্শে এসে বাঙালির মানসিক ভুবন গভীরভাবে আলোড়িত হয়। দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে পাঠ নেওয়ার পর শিক্ষিত বাঙালি অনুভব করেন যে, তাঁরা এক মহান জাতির অধঃপতিত বংশধর। তাঁরা তখন দেশের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। কিন্তু পরাধীন দেশে জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায় বিদেশি শাসন। ব্রিটিশ শাসকদের অমানবিক শাসন ও শোষণে দেশের মানুষ তখন চরম দুরবস্থায় পতিত। জাতিকে সেই অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করার কথা ভাবেন কেউ কেউ। কিন্তু তাঁদের অনেকেই ব্রিটিশ শাসনের বিকল্প কল্পনা করতে পারতেন না। বরং ইংরেজদের ছত্রছায়ায় থাকা নিরাপদ বোধ করতেন এক শ্রেণির বাঙালি। তাই জাতীয়তাবাদের উচ্চারণে তাঁরা বিশেষ উচ্চকণ্ঠ হতে পারেননি। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে বাংলা সাহিত্যে যে জাতীয়তাবাদী উচ্চারণ শোনা

Scanned with CamScanner

যায় তা আবহমান কালের বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র স্বর হিসাবে চিহ্নিত। বাংলা সাহিত্য এই সময় নব নব সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কাব্য-কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, গল্প-উপন্যাস, পত্র-পত্রিকা — এসবের মধ্যে দেশের পরাধীনতার গ্লানি ও জাতির দুরবস্থার কথা তুলে ধরে জাতীয়তাবাদী ভাব উদ্দীপনের চেষ্টা করা হয়।

শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে নাটক এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নির্যাতিত জনগণের পক্ষ নিয়ে বাংলা ভাষায় রচিত হয় একাধিক নাটক। সেগুলির মধ্যে -'দর্পণ' যোগে শিরোনামাঙ্কিত নাটকগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। দীনবন্ধু মিত্র শুরু করেন 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটক দিয়ে। আমাদের দেশে নীলচাষ বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে এ নাটকের পরোক্ষ প্রভাবের কথা সকলেরই জানা। নাটকটি সে সময় এত জনপ্রিয় হয় যে, তাকে অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় রচিত হয় একাধিক 'দর্পণ' নাটক। যেমন — 'সাক্ষাৎ-দর্পণ' (১৮৭২), 'পল্লীগ্রাম-দর্পণ' (১৮৭৩), 'জমীদার-দর্পণ' (১৮৭৩), 'চা-কর দর্পণ' (১৮৭৫), 'জেল-দর্পণ' (১৮৭৫), 'টাইটেল -দর্পণ' (১৮৮৪), 'বঙ্গদর্পণ' (১৮৮৪) প্রভৃতি। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে প্রতিবিম্বিত হয়েছে নীলকর সাহেবদের মুখ। মীর মশাররফ হোসেন 'জমীদার দর্পণ' নাটকে জমিদারদের 'নিজ নিজ মুখ' দেখার ব্যবস্থা করে দেন। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় চা-কর সাহেবদের দুর্বিসহ অত্যাচারকে তুলে ধরেন 'চা-কর দর্পণ' নাটকে। একই বছরে জেলবন্দিদের উপর ইংরেজ শাসকদের অকথ্য নির্যাতনের কথা তুলে ধরেন 'জেল-দর্পণ' নাটকে। এই নাটকটি ভারতের জাতীয়তাবাদ উদ্দীপনের সাহিত্যিক প্রয়াস হিসাবে বিশেষ স্থান পাবার যোগ্য। কিন্তু সে বিষয়ে আলোকপাত তুলনায় অনেক কম। সাহিত্যের ছাত্রের বাইরে নাটকটির পরিচিতি খুব একটা আছে বলে আমাদের মনে হয় না। কিন্তু সমকালীন জাতীয়তাবাদের উদ্দীপন ও বিকাশে নাটকটি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা নাটকটি নিবিড়ভাবে পাঠ করলে বোঝা যায়।

'জেলদর্পণ' নাটকে প্রস্তাবনা বা ভূমিকা যোগ করে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার কোনো প্রয়াস আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে নাট্যকার সংস্কৃত, হিন্দি, বাংলা এবং ইংরেজি ভাষা থেকে চারটি উদ্ধৃতি যোগ করেছেন। তা থেকেই নাট্যকারের অভিপ্রায়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রথম উদ্ধৃতিটি গৃহীত হয়েছে আচার্য শঙ্করের 'মোহমুদ্গরঃ' নামক' কবিতা থেকে। এই কবিতায় মোট ষোলোটি শ্লোক আছে। তার মধ্যে সপ্তম শ্লোকটি এই নাটকে উদ্ধৃত হয়েছে —

"অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং, তদপি নমুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডম্।।"[১]

শ্লোকটির অর্থ হল — অঙ্গ শিথিল হয়েছে, মাথা সাদা চুলে ভরে গেছে, মুখ দন্তহীন হয়ে পড়েছে এবং হস্তধৃত লাঠি কম্পিত হয়ে শোভা পাচ্ছে; তবুও লোকে আশাভাণ্ড ত্যাগ করতে পারছে না। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবাসীর জাতীয় জড়তার কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষ করে, ইংরেজদের জেলে একবার ঢুকলে ক্রমাগত অত্যাচারে বন্দিদের অবস্থা এরকমই বিধ্বস্ত হত। অনেকে মৃত্যুমুখেও পতিত হত। তবুও জীবনে বেঁচে থাকার ক্ষীণ আশা নিয়ে তারা প্রতীক্ষা করে থাকত আগামী দিনের জন্য। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি গৃহীত হয়েছে প্রচলিত এক হিন্দি কথার সূত্র ধরে। সেটি হল—

"এসা দিন নেহি রহে গা।"[২]

দিনের পর দিন অত্যাচারে জেল বন্দিরা মৃতপ্রায়। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত। কিন্তু নাট্যকার তাদের আশার বাণী শুনিয়েছেন এই বলে যে— এমন দিন থাকবে না। ইতিহাসের ধারাপথ অনুসরণ করে তিনি এখানে তত্ত্বজ্ঞানী দার্শনিকের মতো জাতির মনে আশার আলো সঞ্চার করেছেন। অন্যায় অত্যাচার যতই প্রবল হোক না কেন, তারও একদিন অবসান আছে। এই আশ্বাস বাণী পরাধীন জাতির মনে আশার সঞ্চার করে। তৃতীয়টি গৃহীত হয়েছে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্য থেকে। উদ্ধৃতিটি হল —

"কোটী কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় রে নরকের প্রায়।
মুহূর্ত্তের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় রে স্বর্গ সুখ তায়।।"[৩]

এই অংশটির সঙ্গে মূল রচনার কিছুটা পাঠভেদ লক্ষ্য করা যায়। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে 'রে' এর স্থলে 'হে' এবং 'মুহূর্ত্তের' শব্দের জায়গায় 'দিনেকের' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল।[৪] মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়দের উদ্দেশ্যে ভীমসিংহের এই বাণী আত্ম-সচেতন জাতির পরাধীনতার বেদনাকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই নাটকে সেই কথার উল্লেখ করে নাট্যকার দেশবাসীকে আবার তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

চতুর্থ উদ্ধৃতিটি গৃহীত হয়েছে উইলিয়াম কপার (১৭৩১-১৮০০) -এর 'Task -II' (১৭৮৫) গ্রন্থ থেকে। উক্ত গ্রন্থে মোট ছটি অমিত্রাক্ষর গাথা আছে। তার মধ্যে দ্বিতীয়টি 'The Time Piece' -এ দেশের প্রতি ভালোবাসার আবেগময় প্রকাশ পাঠক হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন দেশের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। তাই এই কবিতার ২০৬ নম্বর চরণটি তিনি আখ্যাপত্রে উদ্ধৃত করেছেন —

"England, with all thy faults, I love thee still."[৫]

এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে নাট্যকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমরা বুঝে নিতে পারি। ব্রিটিশ জেলে ভারতীয় বন্দিদের প্রতি অমানবিক নির্যাতনের কথা তুলে ধরার আগে দীন-হীন জাতির শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পরাধীন জীবনের প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি এভাবেই ব্যক্ত করেছেন।

নাটকের মূল সমস্যায় প্রবেশের আগে শুরুতেই নাট্যকার দুটি অপ্রধান চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে সমকালীন একটা 'নূতন খপর' (খবর) -এর অবতারণা করেছেন। বরোদার রাজা মলহর রাও গাইকোয়ার (১৮৩১- ১৮৮২) -এর নামে অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি তাঁর রাজ্যে অবস্থিত ব্রিটিশ রেসিডেন্ট কর্নেল ফেয়ারকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছেন। এই অভিযোগে তাঁর নামে মামলা রুজু করা হয়। মামলা চলাকালীন রাজাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। বড়লাট নর্থব্রুক অভিযোগটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে বিচারের জন্য তিনজন ভারতীয় ও তিনজন ব্রিটিশ সদস্য নিয়ে একটি কমিশন গঠন করেন। কিন্তু মামলা তাতে নিষ্পত্তি হয়নি। তখন মলহর রাও বিলাত থেকে একজন ভালো ব্যারিস্টার খোঁজ করে ব্যালেন্টাইনকে নিয়ে আসেন। কর্নেল ফেয়ার অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করতে পারেননি। ব্যালেন্টাইনও মামলা নিষ্পত্তি করতে পারেননি। তখন মোকদ্দমার রিপোর্ট বিলাতে পাঠানো হয়। স্টেট সেক্রেটারি রায় দেন যে, এই মামলার ভিত্তিতে

Scanned with CamScanner

গাইকোয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করা যাবে না। তাতে সমস্যা সৃষ্টি করেন নর্থব্রুক। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, গাইকোয়ারকে রাজ্য ফিরিয়ে দিলে তিনি কর্মত্যাগ করবেন। সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেন। গাইকোয়ারের অযোগ্যতা ও অপশাসনের দোহাই দিয়ে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে সমকালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

গাইকোয়ারের প্রতি অবিচারের ঘটনাটি বাংলার জনমানসেও ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। 'সোমপ্রকাশ', 'অমৃতবাজার' প্রভৃতি পত্রিকায় ইংরেজদের এই অন্যায়নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। গাইকোয়ারের ঘটনাটি পর্যালোচনা করে 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় লেখা হয় —

> "Proofs will be found in abundance that Col. Phayre was constantly hostile to the Gaekwad, and wounded his feelings on every occasion. ... and when the Gaekwad wanted to punish them, the resident reported him to the India Government as an oppressive Chief. Possibly Baroda would never have come to such a crisis if Colonel Phayre had not been appointed ..... It was impossible for human nature to be silent in such a position" [৬]

বাঙালি নাট্যকারেরাও এই ঘটনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং নাটকের মাধ্যমে বিষয়টি জনসমক্ষে তুলে ধরেন। বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কে অন্তত তিনটি নাটক রচনার কথা জানা যায় - নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুইকোয়ার' (১৮৭৫), সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'গুইকোয়ার' (১৮৭৫) এবং অমৃতলাল বসুর 'হীরকচূর্ণ' (১৮৭৫)। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় এই ঘটনা নিয়ে স্বতন্ত্র কোনো নাটক লেখেননি। তবে তিনি বিষয়টি এড়িয়েও যেতে পারেননি। তাই তিনি বিষয়টি উল্লেখ করেছেন 'জেল-দর্পণ' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে। এখানে জমিদার শিবনাথ বাবুর দুই বন্ধুর মধ্যে আলোচনার সময় গোপাল তারিণীকে বলেছে —

> "বরদার নাম শুনেছ? সেখানকার রাজা মলহার রাও ইংলিস রেসিডেন্ট কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ খাওয়াইতে গিয়াছিলেন বলে ধরা পড়ে। তারপর অনেক মামলা মোকর্দ্দমা হলো। রাজা বিলাত থেকে একজন ভাল বারিস্টার, তার নাম ব্যালন্টাইনকে দুই লক্ষ টাকা খরচ করে এনেছিলেন। ব্যালান্টাইন দিন রাত্রি ধরে বক্তৃতা কল্লে, তা কিছুতেই কিছু হলো না। ইংরেজদের গোঁ আর বুন শুয়ারের গোঁ একই রকম, এ যাবার নয়। রাজাকে কলে কৌশলে রাজ্যচ্যুত করা হলো।" [৭]

ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্য বিস্তারের এই জঘন্য কৌশল এবং বিচার ব্যবস্থার অসারতা ভারতীয়দের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নাটকে এই ঘটনার পরোক্ষ উল্লেখের মাধ্যমে নাটককার দেশবাসীর মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী ভাবধারা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ব্রিটিশরা একজন প্রাদেশিক রাজাকে যদি মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে সিংহাসনচ্যুত করতে পারেন তাহলে সাধারণ মানুষের প্রতি কীরকম অবিচার চলত তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

"বরদার নাম শুনেছ? সেখানকার রাজা মলহার রাও ইংলিস রেসিডেন্ট কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ খাওয়াইতে গিয়াছিলেন বলে ধরা পড়ে। তারপর অনেক মামলা মোকর্দ্দমা হলো। রাজা বিলাত থেকে একজন ভাল বারিস্টার, তার নাম ব্যালন্টাইনকে দুই লক্ষ টাকা খরচ করে এনেছিলেন। ব্যালান্টাইন দিন রাত্রি ধরে বক্তৃতা কল্লে, তা কিছুতেই কিছু হলো না। ইংরেজদের গোঁ আর বুন শুয়ারের গোঁ একই রকম, এ যাবার নয়। রাজাকে কলে কৌশলে রাজ্যচ্যুত করা হলো।"

জেলবন্দিদের প্রতি অমানবিক ব্যবহারের ছবি তুলে ধরার আগে তাদের কীরকম কৌশলে জেলে দেওয়া হত তার নমুনা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ব্রিটিশ আমলেও এখনকার মতো দু'ধরনের মামলার ফলে জেল হত — দেওয়ানি ও ফৌজদারি। মামলা অনুযায়ী শাস্তিরও রকমফের ছিল। শিবনাথ বাবু, শ্যামচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র দেওয়ানি মামলার অভিযোগে ধৃত আসামী। এঁদের মধ্যে শিবনাথবাবু ছিলেন ধনী জমিদার। তারিণী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন —

> "তাই তো ভাই এত বড় লোকের ছেলে সামান্য ২০/৩০ হাজার টাকার জন্য জেলে গেল। যার বাপের নামে বাগে গরুতে জল খেত, যার বাপ একজন দলপতি ছিলেন, বিষয়ের তো সীমা পরিসীমা ছিল না।" [৮]

কিন্তু এত অর্থবান হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাবুয়ানির সবটুকু রপ্ত করে মদ, গাঁজা, গুলি, বেশ্যালয় আর ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে উচ্ছন্নে যাবার পথ প্রস্তুত করে ফেলেছেন। শিবনাথ বাবুর মাধ্যমে নাট্যকার তখনকার কলকাতার বাবু কালচারের তথ্যটি সামান্য হলেও ব্যক্ত করেছেন। ঘরে সতী সাবিত্রী স্ত্রী সুরবালাকে ছেড়ে তিনি পড়ে থাকতেন সোনাগাছিতে রক্ষিতা বিরাজের কাছে। বিরাজও কম চালাক নয়। সে ছলা-কলা করে শিবনাথ বাবুর অর্থ গ্রাস করে তাঁর জমিদারি ফেল করে দেওয়ার জায়গায় তুলে দিয়েছে। ঋণ পরিশোধ করতে না-পারায় তাঁর জেল হয়েছে।

Scanned with CamScanner

বাবুয়ানিকে বজায় রাখতে গিয়ে সেকালে কলকাতার অনেক ধনী জমিদারের এই দশা হয়েছিল। বিরাজের কথা থেকে তা বোঝা যায় —

> "তাই তো গা, এত বড় মানুষের ছেলে, এত বিষয় সব নষ্ট করে এখন জেলে যেতে হলো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। তা ওঁরই বা দোষ কি? কলকেতার কত বড় লোকের এইরূপ দশা ঘটেছে।" [৯]

জেলবন্দিদের দুরবস্থার কথা বলার আগে জেলে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নাট্যকার এইসব ঘটনার প্রতি আলোকপাত করেছেন।

ব্রিটিশ জেল ব্যবস্থার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের তিনি উল্লেখ করেছেন। দুজন ভারতীয়ের মধ্যে মামলায় কোন কারণে একজনকে জেলে দেওয়া হলে অন্যজনকেও প্রচুর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হত। জেলবন্দিদের খোরাকি তাদের বহন করতে হত। জেল ব্যবস্থার এই অমানবিক দিকটির কথা জানা যায় শ্যামচন্দ্রের কথায় —

> " যারা দেনার জন্য জেল দেয়, তারা অত্যন্ত বোকা। কেন না এক তো টাকা ধার দিয়েছে, তারপর কত মোকর্দ্দমা মামলা করে ডিক্রি করলে, শেষ কালে জেলে দিলেই তাদের সব পাওনা চুকে গেল। কেবল যে পাওনা গেল তা নয়, আবার ঘর থেকে রোজ রোজ খোরাকি দিতে হয়। আমি যদি কাহাকে টাকা ধার দিতুম, আর সে যদি না দিতে পারত, তা হলে কোন শালা তাকে জেলে দিত। জেলে দিয়ে লাভ তো বড়, ঘর থেকে খোরাকি দেওয়া বড় শক্ত কথা তার কি?" [১০]

ইংরেজদের বিচারালয়ে এদেশীয় মামলাকারীদের মধ্যে বাদীপক্ষ ধার দেওয়া টাকা পরিশোধ পেত না। তার ওপর মামলার জন্য তাদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হত। এজন্য ঋণ পরিশোধ না পেলেও অনেকে মামলা করতে চাইত না। যদিও বা কেউ মামলা করত তাহলে তাকে পড়তে হত যাঁতাকলে। ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রচুর সম্পদ লুঠ করে নিলেও সামান্যতম ব্যয় তাঁরা এদেশীয়দের জন্য করতে চাইতেন না। বন্দিদের খোরাকিও আদায় করা হত বাদীপক্ষের কাছ থেকে। এরকম শোষণ নীতি এদেশীয় জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী ভাবধারা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে আর নাটকের মধ্যে তা তুলে ধরে নাট্যকার জাতীয়তাবাদী ভাব উদ্দীপনের চেষ্টা করেছেন।

ব্রিটিশ জেলে ফৌজদারী অপরাধীদের প্রতি যে অমানবিক আচরণ চলত তা বর্ণনাতীত। গোপাল, তারিণী আর মধু শিবনাথবাবুর টাকা-পয়সা, হীরের আংটি, কোম্পানির কাগজ হাতিয়ে ভাগ-বখরা করার সময় হাতে নাতে ধরা পড়ে। তাদের প্রথমে দেওয়া হয় আলিপুর জেলে। সেখানে তাদের জোর করে আসামীর বেশ (ন্যাঙ্গট) পরিধান করানো হয়। কয়েদিরা তা পরতে ইতস্তত করলে জেলের দারোগা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন —

> "যদি প্রাণে এত সাধ আছে, তবে চুরি কর্ত্তে গিয়েছিলে কেন? সে সময় এ সকল মনে হয় নাই যে গবর্নমেন্টের জেল আছে, সেখানে পাথর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ঘানি টানতে টানতে কল ঠেলতে ঠেলতে মুখে রক্ত উঠতে থাকবে।" [১১]

বন্দিরা তা জানে না, তা নয়। তাই গোপাল আগেভাগেই মেথরের কাজ চেয়ে নেয়। আর তারিণী ও মধুকে লাগিয়ে দেওয়া হয় কলঘরে। কিন্তু কলঘরে যোগ দেবার আগেই ভয়ে মধুর প্রাণ শুকিয়ে গেছে। সে একটু জল পান করতে চায়। কিন্তু ইন্সপেক্টর তা দিতে চান না। তখন তারিণী বলে —

> "সাহেব তোমাদের শরীরে তো বড় দয়া, তোমাদের এ গালে চড় মারলে না ও গাল পেতে দাও? এদেশের লোকেরাও বলে, আর সকল দেশের লোকেই বলে ইংরেজদের মত দয়াশীল আর এজগতে নাই। তাইতো বুঝি তোমার দয়া প্রকাশ হচ্ছে?" [১২]

এই উক্তির মাধ্যমে তারিণী একদিকে যেমন সমকালীন দেশীয় মানুষদের ইংরেজ নির্ভরতাকে প্রকাশ করেছে; অন্যদিকে কিছুটা ব্যঙ্গের ঝাঁঝও মিশিয়েছে। ইন্সপেক্টর একথার মমার্থ যাই বুঝুক না কেন তিনি তারিণীকে জল দেওয়ার পরিবর্তে চাবুকের দ্বারা প্রহার করেছেন। তাতে এত জোর ছিল যে তারিণীর পিঠে দু'আঙুল ফুলে উঠে। তখন ইংরেজদের জেলে ভারতীয় বন্দিদের সম্পর্কে প্রচলিত অভিজ্ঞতার কথাকে অস্বীকার করে বলে ওঠে —

> "লোকে বলে জেলে এখন অত্যাচার নাই। ও বাঃ এটা কম হলো কি ? যারা জানে না, যারা ইংরেজদের দোষ দেখতে পায় না, তারাই বলে।" [১৩]

তারিণী ও মধু অবশ্য এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করে যে, তাদের কলে জুড়ে দিয়েছে। কারণ তারা মনে করে যে, জেলখানার ঘানিটানা আরও বেশি কষ্টদায়ক। তারিণীর মুখ থেকে শোনা যায় —

> "জেলখানার ঘানিগাছ আর ট্রেড-মিলের মতো কষ্টদায়ক শাস্তি আর পৃথিবীতে আছে কি-না সন্দেহ।" [১৪]

ইংরেজদের জেলখানায় বন্দিদের বদলি নীতি প্রচলিত ছিল । গোপালকে আলিপুর জেল থেকে যশোহর জেলে বদলি করা হয়। সেখানকার জেলের অত্যাচারের কথা সে পরাণের কাছ থেকে শুনেছে। লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দেওয়ার রীতি সে জেলেও রয়েছে। একজন কয়েদির পাতে রুটি কম হওয়ার অজুহাতে সাহেব রাঁধুনিকে খাদ্যরত অবস্থা থেকে ডেকে নিয়ে এসে দশ-পনের ঘা বেত্রাঘাত করেন। যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে থাকে। সেই সাহেবের হুকুমেই পরাণ ও গোপালকে ঘানিগাছের সঙ্গে ঝাঁধা হয়। যন্ত্রচালিত ঘানি কল প্রচলিত হওয়ার আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে তেল নিষ্কাষণের জন্য পশু চালিত ঘানি কল প্রচলিত ছিল। একটি দণ্ডের এক প্রান্তে বেঁধে গোরু-মোষকে দিয়ে যে কাজ করানো হত ব্রিটিশ জেলে কয়েদিদের দ্বারা তা করানো হত। তাতে তেল কতটা বের হত সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে; কিন্তু কয়েদিদের তেজ যে বেরিয়ে যেত তা অস্বীকার করা যাবে না। সামান্য পরিমাণে খাবার খেয়ে এরকম পরিশ্রম করে কয়েদিরা হীনবল হয়ে পড়ত। জেলখানার চাপরাশিরাও বন্দিদের প্রতি অমানবিক আচরণ করত। স্বজাতির কষ্ট দেখে তাদের মনে দয়া হয় না। বরং কয়েদিদের শাস্তি পেতে দেখে তারা কৌতুক অনুভব করে এবং ভাবে—

> "মানুষগুলোকে ঘানিতে তুলে দিলে যেমন চমৎকার দেখায়, বলদগুলোকে জুড়ে দিলে তত সুন্দর দেখায়

Scanned with CamScanner

না। গরুগুলির যেমন ল্যাজ আছে, এই বেটাদের তেমনি ল্যাজ থাকতো, তা হলে ল্যাজ ধরে ঘুরপাক খাবার বড়ই মজা হতো।" [১৫]

গোপাল ও তারিণী ঘানি ঘোরাতে থাকে। কিন্তু জেলের ঘানি ঘোরানো খুব সহজ কাজ নয়। এরকম অমানবিক অত্যাচার তারা সহ্য করতে পারে না। কষ্টে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তবুও তারা ছাড়া পায় না । সাহেব তাদের দেখে ভাবেন —

"জেল দুষ্ট লোকদের শাসনের জন্য হইয়াছে, এখানে দুষ্ট বদমায়েস লোক বিলক্ষণ শাসন হয়। god যেমন heaven এ শাস্তি দেন এখানে অন্যায় কাজ করিলে government সেইরূপ punishment দেন। আমার মতে prisoner-দের বিলক্ষণ কঠিন শাস্তি দেওয়া উচিত in the case either they live or die."[১৬]

জেলের ঘানি ঘোরাতে ঘোরাতে সর্দি-গরমে পরাণের যায় যায় অবস্থা। আর জল না পেয়ে গোপালের প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়। তবুও তাকে জল দেওয়া হয় না। শেষ পর্যন্ত রক্ত বমি হয়ে গোপালের মৃত্যু হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের তাতে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। বরং তিনি বলেন—

"এ আদমির consumption ছিল। তা না হলে blood পড়বে কেন? (সহাস্যে) আচ্ছা হুয়া এ রকম না হলে বাঙ্গালী লোকেরা জব্দ হয় না। জেল punishment দিবার জন্য - এখানে কয়েদি মরে যাক বেঁচে থাক তাহাতে আমাদের কি? We must do our duty." [১৭]

শুধুমাত্র কর্তব্যের দোহাই দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট যে আচরণ বন্দিদের প্রতি করেছেন তাকে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কোন মানুষ সমর্থন করতে পারেন না। জেল বন্দিদের প্রতি সাহেবদের এই নিষ্ঠুর আচরণের চিত্র তুলে ধরে নাট্যকার স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী ভাবধারা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

ব্রিটিশ সরকারের অধীনে যাঁরা চাকরি করতেন তাঁরাও বিশেষ সুখে ছিলেন না। জেল ডাক্তারদের বন্দি-সুলভ জীবন যাপন করতে হত। জীবনের স্বাভাবিক আনন্দ থেকে তাঁরাও বঞ্চিত ছিলেন। অনুশোচনা ও আত্মগ্লানিতে তাঁদের কাজ করতে ভালো লাগত না। তবুও চুক্তি অনুযায়ী তাঁরা কাজ করে যেতে বাধ্য হতেন। বন্দিদের দুরবস্থা ডাক্তারদের অসহ্য লাগত। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের কথা শুনতেন না। কলঘরে বা ঘানিতে জুড়ে দিয়ে যে নিষ্ঠুর আচরণ বন্দিদের প্রতি করা হত তাতে সংশোধনের পরিবর্তে অপরাধীরা আরো বেশি বিকৃত হয়ে যেত বা প্রাণে মারা পড়ত। গোপালের শাস্তির পরিণাম দেখে ডাক্তারের মনে হয় —

"বাবা জেল কি মনুষ্যদিগের বধের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে? না এখানে দুষ্ট লোকদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য হইয়াছে? এখানে চরিত্র পরিবর্তন হওয়া দূরে থাক, আরো বেশি বিকৃত হইয়া যায়।.....কয়েদিদের কোথায় সৎ উপদেশ দেওয়া হইবে, তাহা না হইয়া অন্যায়-পূর্বক তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিলে বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে।" [১৮]

আমরাও জানি, অপরাধীদের জেলে দেওয়া হয় সংশোধনের জন্য। তাই জেলখানার অপর নাম সংশোধনাগার। বন্দিদের নীতি উপদেশ দিয়ে বা আটক করে রেখে তাদের মানসিক পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হয় জেলখানায়। ভবিষ্যতে তারা যাতে জীবনের মূল স্রোতে ফিরতে পারে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকাও সেখানে কাম্য । কিন্তু ব্রিটিশ আমলে এদেশীয় বন্দিদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হত যে, তারা অনেকেই প্রাণে বেঁচে ঘরে ফিরতে পারত না। ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হত। গোপালেরও তাই হয়েছিল। ঘানিগাছের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার শাস্তি সহ্য করতে না পেরে রক্ত বমি করতে করতে সে মারা গিয়েছিল।

ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিধিরাম ভট্টাচার্যকে সামান্য কলা চুরির দায়ে জেলে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য সাধ করে তিনি চুরি করেননি। অনেকটা অবস্থার বিপাকে পড়ে তিনি চুরি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করেছেন, কালের কবলে পড়ে মানুষ শ্রাদ্ধ-শান্তি করে না। পুজো প্রায় উঠে গেছে। অধ্যাপক হওয়ার মতো যোগ্যতাও তাঁর নেই। পেটের খাবার জোগাড় করা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় ব্রাহ্মণী গর্ভবতী হয়ে বিভিন্ন রকমের খাবারের বায়না ধরেন। আর তা জোগাড় করতে গিয়ে তিনি শিষ্যের বাগান থেকে এক কাঁদি কলা চুরি করেছেন। ফলস্বরূপ, তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে দেওয়া হয়। শাস্তি হিসাবে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে কুড়ি ঘা বেত মারার হুকুম দেন। ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডাক্তারের কাছে অনুমতি নিতে পাঠান। ব্রাহ্মণের নাদুস-নুদুস শরীর দেখে জেল ডাক্তার লিখে দেন যে, তিনি দশ-ঘায়ের বেশি বেত্রাঘাত সহ্য করতে পারবেন না। ম্যাজিস্ট্রেট তা মানতে চাননি। তিনি বলেছেন —

"I Can not believe it. Native doctors are good for nothing, they are some what better than compounders. What they know?" [১৯]

'নেটিভ'-দের সম্পর্কে এমন অবজ্ঞার মনোভাব ব্রিটিশদের বরাবরই ছিল—এমনকি দেশীয় ডাক্তারদের সম্পর্কেও। তাই দেশীয় ব্যক্তিদের উপযুক্ত দক্ষতা থাকলেও তাঁরা যোগ্যতা অনুযায়ী পদমর্যাদা পেতেন না। ম্যাজিস্ট্রেটের এমন মন্তব্য স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়দের মধ্যে প্রতি-জাতিবৈর মনোভাবকে কিছুটা হলেও উস্‌কে দেয়। এদিকে ডাক্তারবাবুর মতামত অগ্রাহ্য করে ম্যাজিস্ট্রেট নিধিরামকে প্রথমে কুড়ি ও পরে আরো দশ ঘা বেত্রাঘাত করার হুকুম দেন। নিধিরাম তা সহ্য করতে না পেরে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন এবং মূর্ছা যান। সামান্য অপরাধে নিধিরাম বাবুকে যে শাস্তি দেওয়া হয় তা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ না করে পারে না।

কয়েদিদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক জেল থেকে অন্য জেলে বদলি করা হত। আর বিভিন্ন জেলারের হাতে পড়ে তারা বিচিত্র রকমের শাস্তি ভোগ করত। মধু ও তারিণীকে একসময় বর্ধমান জেলে বদলি করা হয়। এখানে তুলনায় কম-কঠিন কাজে জুড়ে দিলেও তাদের শরীর তা সহ্য করতে পারে না। ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপে পড়ে তারা দিনদিন হীনবল হয়ে পড়ে। আধপেটা খাবার খেয়ে তারা সেরে উঠতেও পারে না। জ্বরে ভুগলেও তারিণীকে দুই থলে করে পাথর ভাঙতে হয়। কিন্তু রোগগ্রস্ত শরীরে সে আর পারে না। তখন কাজ না করার দায়ে তাকে নির্মমভাবে প্রহার করা হয়। এরপর মধুকে বদলি করা হয় বাঁকুড়া জেলে।

Scanned with CamScanner

সেখানকার জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর শাস্তি দেওয়ার ধরন একটু অন্য রকম। সংবাদপত্র পাঠ করে তিনি জানতে পারেন যে ভূতপূর্ব লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্বেল নাকি বলে গিয়েছেন —

> "That the pettiest criminals should be kept hard at work on the oil mill, while the worst criminals are at once placed on comparatively easy work, is obviously unreasonable." [২০]

সেই ভাবনা অনুযায়ী তিনি পুরাতন আসামি মধুকে তুলনায় সহজ কাজে নিযুক্ত করার কথা ভাবেন। কিন্তু তাঁর নজর পড়ে মধুর চুলের প্রতি। তার চুল কাটানোর জন্য ডেকে পাঠানো হয় এক নিষ্ঠুর নাপিতকে। সে ভোঁতা ক্ষুর দিয়ে এমন টান দেয় যে, মধুর ছাল-চামড়া উঠে আসে। আর এই কাজে দক্ষতার কথা বলতে গিয়ে সে জানায় —

> "আমার নাম শুনেছ তো রক্ত কিঙ্কিনী রক্ত ঝিন-ঝিনী।
> আমি যখন যাকে কামাই রক্ত না পড়লে ছাড়িনা।" [২১]

একথা বলতে না বলতে তার ক্ষুরের টানে মধুর মাথা থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। একখানি কাপড় সেই রক্তে ভিজে যায়। এ অবস্থা দেখেও কারো দয়া-মায়া হয় না। বরং জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট উল্টে বলেন তার মাথায় কোনো 'Desease' ছিল।

ব্রিটিশ আমলে সাধারণ কয়েদিদের শাস্তি দেওয়ার জন্য যেমন জেল ছিল, তেমনি পাগলদের জন্য পাগলা গারদেরও ব্যবস্থা ছিল। কেষ্ট ও বেষ্ট নামের দুই পাগলকে সেখানে আটকে রাখা হয়েছে। পাগলদের প্রতি কেমন ব্যবহার করা হত তার কোনো বিবরণ এই নাটকে তুলে ধরা হয়নি। তবে স্বদেশের জন্য তারা যে দুটি দীর্ঘ বক্তৃতা রেখেছে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাগলামির ছলে বেষ্ট বলেছে —

> "ভারতবাসীগণ, তোমরা আর নিদ্রায় অচেতন হইয়া, অভীভূত হইয়া থাকিও না, একবার চক্ষুন্মিলন করিয়া দেখ ভারতের কি দশা হয়েছে। সোনার ভারত কি ছিল, কি হল? ..... ভারত কি নির্জ্জীব? একথা কে বলিবে? এখানে কোটী কোটী ভারতবাসীর বাস, ... ইহাদের মরণ বাঁচনের কাটী ইংরাজদিগের নিকট, ইংরেজরা ইহাদের গাত্রে যখন যে কাটিটী ছোয়াইয়া দেন, তখনই তাহারা সেই দশা প্রাপ্ত হয়। ... ভারতবাসীগণ, তোমরা এক ঐক্যতা অভাবে এরূপ হীনবস্থায় পতিত হইয়াছ, তাহা কি একবার নয়ন মেলিয়া দেখিতেছ না, তোমাদের অনৈক্যতায় বাঙ্গালী নাম অন্তর্হিত হইবার উদ্যোগ হইল, তোমাদের অনৈক্যতায় ছোট বড়লাট সাহেবরা যখন যে আইন কানুন ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতেছেন।" [২২]

এরকম অবস্থায় ভারতবাসী খুব সহজে স্বাধীন হতে পারবে না তা সে বুঝেছে। তাই প্রথমে সে জাতীয় ঐক্য স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছে। সমকালীন ভারতীয় প্রেক্ষিতে যা একান্ত জরুরি ছিল। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি এবং শারীরিক ও মানসিক বল বৃদ্ধি করলে ভারতীয়রা নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে পারবে এবং অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আধিপত্য বিস্তার করে ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে চাইছে। রাশিয়ার কাবুল অধিকার, ব্রহ্মদেশের বিবাদ, চিনের যুদ্ধ প্রস্তুতি ইত্যাদির ফলে ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। সমগ্র ভারতবাসীকে একজোট হয়ে এর প্রতিবাদ করার আহ্বান শোনা যায় তার কণ্ঠে। এরকমই আহ্বান শোনা গিয়েছিল কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' (১৮৭৩) নাটকে দেশের পরাধীনতার জন্য ভারতবাসীর অনৈক্যতাকে দায়ী করে সেখানে লেখা হয়েছিল —

> "ভ্রাতৃগন, অনৈকতা, আত্মাভিমান ও স্বজাতি হিংসাই তোমাদের সর্ব্বনাশের মূল। যতদিন তোমাদের অন্তর হতে এসকল ভাব দূরীভূত না হবে, ততদিন তোমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।" [২৩]

অন্যদিকে দেশের হীন অবস্থার জন্য কেষ্ট বঙ্গবাসীকে ধিক্কার জানিয়েছে। বাংলার ধনী জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের একাংশ বাবুয়ানিকে বজায় রাখতে গিয়ে সুরা ও বেশ্যার পাল্লায় পড়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছে। তাদেরকে সতর্ক করে দেবার জন্য কেষ্ট বলেছে—

> "হে বঙ্গবাসীগণ, ... তোমারা বঙ্গমাতাকে অনাথিনী, পাগলিনী; ভিখারিণী, কাঙ্গালিনী দেখিতেছ, তথাপি, তাহার একটী কোন সদুপায় করিতেছ না। তোমাদের মাতা বিজাতীয়ের দাসী, তোমাদের মাতা অনেক দিবসাবধি পরের দাসত্ব করিতেছে, তথাপি তোমরা একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখনা।"[২৪]

কেষ্ট ও বেষ্টর এই দীর্ঘ সংলাপ শুধুই কি পাগলের প্রলাপ? না, নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশের কৌশল? নাট্যকার যে কথা সরাসরি বলতে পারেননি বা সাধারণ কয়েদিদের দ্বারা প্রকাশ করতে পারেননি, তা করেছেন পাগলদের মাধ্যমে। নাটকের বিভিন্ন অঙ্কে কয়েদিদের প্রতি ক্রমাগত নির্যাতনের যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে সেখানে প্রতিকার বা প্রতিরোধের কোনো জায়গা ছিল না। প্রবল প্রতাপান্বিত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে কয়েদিদের কিছু করারও ছিল না। তাই সেরকম কোনো দৃশ্যের অবতারণা করলে তা বাস্তব সম্মত হত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। কিন্তু নাট্যকার তাঁর মনোগত অভিপ্রায়টি প্রকাশ না করেও পারেননি। তিনি পাগলা গারদের দুই পাগলের মাধ্যমে জাতিকে সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ করার আহ্বান জানিয়েছেন। কেষ্ট ও বেষ্টর দীর্ঘ ভাষণের মাধ্যমে তিনি দর্শকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

নাট্যশিল্পের মানদণ্ডের বিচারে নাটকটির মধ্যে কিছু অসম্পূর্ণতা লক্ষ করা যায়। 'জেল দর্পণ' নাটকে নাট্যকারের মূল অভিপ্রায় ছিল জেলবন্দিদের প্রতি পুলিশ প্রশাসনের অমানবিক নির্যাতনের এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরা। তা করতে গিয়ে তিনি জমিদার শিবচরণ বাবুর পারিবারিক জীবনের মর্মান্তিক পরিণতিকে অনেকটা প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার সেখানেও পরিপাটির অভাব রয়েছে। শিবচরণ বাবুর চারিত্রিক স্খলন, তাঁর স্ত্রী সুরবালার করুণ পরিণতি এবং পরিশেষে শিববাবুর আত্মগ্লানি ও আত্মহত্যা ট্রাজিক বেদনা উদ্রেক করে না। বরং নাটকের শেষদিকে তাঁর অনুশোচনা—

> "এই নাকে কানে খত নিলেম,
> আর কখন বেশ্যালয়ে যাব না।" [২৫]

Scanned with CamScanner

প্রহসনধর্মী নাটকের পরিণতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার জেলের মধ্যে কয়েদিদের ক্রমাগত নির্যাতন ও মৃত্যু 'মেলোড্রামাটিক সিচুয়েশন' সৃষ্টি করে। 'নীলদর্পণ' নাটকেও এরূপ অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সেখানেও নীলকর সাহেবদের অমানবিক নির্যাতনের ছবি আঁকতে গিয়ে বসু পরিবারের মর্মান্তিক পরিণতির কথা প্রাধান্য লাভ করেছিল। একাধিক মৃত্যুর সংঘটন সেখানেও দেখানো হয়েছিল। সাহেবি অত্যাচারের পটভূমিকায় রচিত পাপ প্রতিষেধক নাটকগুলিতে এরকম অপূর্ণতা কম-বেশি পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য মনে রাখা দরকার, শিল্প সৃষ্টির অভিপ্রায়কে সামনে রেখে এসব নাটক রচিত হয়নি। বিদেশি শাসক ও ব্যবসায়ীরা এদেশীয় মানুষের উপর কীভাবে শাসন ও শোষণ চালাত তার বাস্তব চিত্রকে জনসমক্ষে তুলে ধরার তাগিদ থেকে এগুলি রচিত হয়েছিল। 'জেলদর্পণ' নাটকেও নাট্যকার ভারতীয় কয়েদিদের উপর শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের অমানবিক নির্যাতন ও তার মর্মান্তিক পরিণতিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সেদিক দিয়ে নাটকটি সফল বলা যায়। 'বান্ধব' পত্রিকায় নাটকটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয় —

> "যখন এদেশের অধিকাংশ নাট্যকারই কাব্যের প্রকৃত রাজ্য পরিত্যাগ করে সমাজ, রাজনীতি, ডাক্তারি, মাস্টারি, ওকালতি, দোকানদারি এবং ধর্মপ্রচারাদি বিষয়ে নাটক লিখছিলেন তখন দক্ষিণাবাবুকে নিন্দা করা যায় না। তিনি প্রথম বঙ্গীয় কারাগৃহের অবস্থা নিয়ে নাটক লেখেন, অনেক স্থলে প্রীতিকর, পরিপক্ক ও পরিমার্জিত না হলেও নাটকটি উদ্দীপক ছিল।"[২৬]

ভারতের জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনে 'জেল-দর্পণ ' নাটকটি স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবী রাখে। কারণ সমকালীন অন্যান্য 'দর্পণ' নাটকের তুলনায় এই নাটকটির প্রেক্ষিত কিছুটা বিস্তৃত। 'নীলদর্পণ' নাটকে আক্রমণের লক্ষ্য ছিল নীলকর সাহেব, 'জমিদার দর্পণ' - এ জমিদার, 'চা -কর দর্পণ'-এ চা -কর সাহেব। তাঁদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণের অর্থ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বলা নয়। কিন্তু এ নাটকে ভারতীয় কয়েদিদের উপর ব্রিটিশ শাসকদের নির্যাতনের কথাকে সরাসরি তুলে ধরা হয়েছে। রাজা-জমিদার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলকেই যে-কোনো অজুহাতে শাসকেরা বন্দি করতে পারতেন এবং তাদের প্রতি কীরূপ অমানবিক আচরণ করতেন তা এই নাটকে দেখানো হয়েছে। শাসকদের অত্যাচার সরাসরি তুলে ধরার এরকম প্রয়াস তৎকালে খুব কম নাটকেই দেখা গিয়েছিল। অবশ্য নাট্যশিল্পের মানদণ্ডের বিচারে স্থান নির্ণয় করতে গেলে 'জেল-দর্পণ' নাটকটিকে হয়তো উচ্চাসনে বসানো যাবে না। কিন্তু সমসাময়িক ঘটনার জীবন্ত দলিল হিসাবে এবং জেল বন্দিদের উপর ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের দৃশ্য তুলে ধরে জনমানসে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সাহিত্যিক প্রয়াস হিসাবে নাটকটি চিরস্থায়ী মূল্য পাবার যোগ্য। পরবর্তীকালে কুলি-বন্দিদের দুরবস্থা নিরসনে যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত হয় তার মূলে নাটকটি যথেষ্ট অবদান রাখে। কাজেই একুশ শতকেও এ ধরনের আলোচনা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয়ত্ব বোধকে সুদৃঢ় করতে বিশেষভাবে সহায়তা করবে।

তথ্যসূত্র

১। আচার্য শঙ্কর, 'মোহমুদগর:', 'পঞ্চরত্ন', শ্রী অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা, সদেশ, আশ্বিন ১৪১৪, পৃ. ১৯

২। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়, 'জেল-দর্পণ', কলকাতা, শ্রীদক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ, ১২৮২, আখ্যাপত্র

৩। পূর্বোক্ত, আখ্যাপত্র

৪। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পদ্মিনী উপাখ্যান', কলকাতা, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ, ১৩১২, পৃ. ৭৪

৫। William Cowper, 'The Time Piece', 'Task-II', 'The Poetical Work of William Cowper (Vol. I)', George Gilfillan (edited), London, Jemes Nisbet and Co., 1854, P. 214

৬। প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, 'বাঙ্গলা নাটকে স্বাদেশিকতার প্রভাব (১৮০০-১৯১৪)', কলকাতা, সাহিত্যশ্রী, মার্চ ১৯৭৯, পৃ. ৫২০ - ৫২১

৭। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়, 'জেল- দর্পণ', পৃ. ৩

৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯-৩০

১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

১২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

১৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

১৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

১৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

১৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

১৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

১৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

১৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

২০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬ - ৬৭

২১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

২২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২-৭৩

২৩। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভারতমাতা', কলকাতা, নূতন ভারত যন্ত্রে, শ্রী নৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত, প্রথম প্রকাশ, ১২৮০, পৃ. ১৪

২৪। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়, 'জেল-দর্পণ', পৃ. ৭৪ - ৭৫

২৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭

২৬। কালীপ্রসন্ন ঘোষ (সম্পাদিত), 'বান্ধব', চৈত্র ১২৮২

Scanned with CamScanner

একান্তর

বইমেলা সংখ্যা ২০২০

প্রচ্ছদকাহিনি: সম্পাদনায় মেয়েরা

৩০ বর্ষ

১৪২৬

ক্রোড়পত্র: সুব্রত রুদ্র

রক্তকরবী ও তার সম্পাদক	কান্তিরঞ্জন দে	৭৮
শ্রদ্ধেয় প্রদীপ ভাট্টাচার্য-কে কবিতাগুলি নিবেদিত	তিলোত্তমা মজুমদার	৮৪
কবি সঞ্জীব, কবিতার সঞ্জীব	গৌতম হাজরা	৮৭
দেখা হবে	অদিতি বসু রায়	৯১
ভ্রমণ		
বারাণসী বারবার	ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়	৯৩
রম্যরচনা		
লেখার চাওয়া পাওয়া	বিনতা রায়চৌধুরী	৯৭
কথাসাহিত্য: প্রবন্ধ-গল্প-অণুগল্প-আলোচনা		
শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে': ফিরে দেখা	মনোতোষ দাশগুপ্ত	১০১
আত্মকথার অলিন্দে 'ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি': একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ	মধুবন্তী সোম	১১২
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ: বাংলা সাহিত্যের এক বিরলতম কথাশিল্পীর নাম	ভগীরথ মিশ্র	১১৫
'অন্যায় করি নি'—নিবিড় পাঠ	নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	১১৯
'জ্যোতির্ময়ীদের বাঁচতে দাও': বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু সমাজের পটভূমিকায় রচিত এক আশার আলো	আহেরী দাস	১২৬
উত্তেজনা আছে হ্যায়: প্রগতির গল্প	তৃষ্ণা বসাক	১২৯
অনুবাদ গল্প		
একটা ডাস্টবিনের স্বীকারোক্তি	এম. করুণানিধি/ভাষান্তর: সোনালী ঘোষাল	১৩১
গল্প		
মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৭
অন্ধ পাখি উড়ুক	অমর মিত্র	১৪২
খেলার প্রতিভা	নলিনী বেরা	১৫১
দুঃসময়ের একটি গল্প	সমীরকান্তি বিশ্বাস	১৫৭
একটা বোধ ও একজন সুবোধ	প্রগতি মাইতি	১৬২
দূরত্ব	দিলীপ চৌধুরী	১৬৭
ধুলো	শান্তনু ভট্টাচার্য	১৭২
অণুগল্প		
কবি ও রমণী/চন্দনকাঠের ঘড়ি	নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	১৮১
বৃত্ত	মহুয়া চৌধুরী	১৮৩
কালো মানুষের লুচি	তৃষ্ণা বসাক	১৮৪
৬ ডিসেম্বর	বিতস্তা ঘোষাল	১৮৫
মানুষ	কৃষ্ণা দাস	১৮৬

মধুবন্তী সোম

আত্মকথার অলিন্দে 'ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি': একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ

ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি ॥ সুজাতা ঘোষ ॥ রূপা প্রকাশনী ॥ মূল্য: ১৫০ টাকা

সাজানো গৃহকোণ আর নিকানো উঠোনের উল্টোদিকে মহিলাদের আত্মনুসন্ধানের যে লড়াই, তারই নাম দেওয়া যেতে পারে নারী জীবনচরিত। ইতিহাস ঘাঁটলে চোখে পড়বে সে বাঙালি, আত্মজীবনী রচনা শুরুই করেছে একজন নারীর হাত ধরে। রামসুন্দরী দেবীর 'আমার জীবন' (১৮৬৮) যখন প্রকাশিত হয় তখনও বাংলা সাহিত্য বাংলা আত্মজীবনীর উষ্ণতা অনুভব করেনি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্ম-অনুভব ততদিনে লিপিবদ্ধ হয়ে গেলেও লেখকের নির্দেশানুসারে তখনও তা অগ্রন্থনের অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাছাড়া ঐ একই বছরে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'রাসের ইতিবৃত্ত' প্রকাশিত হয়েছিল রা: সা: (রামচন্দ্র দাস) ছদ্মনামে তবে এই জীবনীটি ছিল অসম্পূর্ণ। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে অন্তঃপুরের এক গৃহবধূ রাসসুন্দরীই বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম আত্মজীবনীকার। মেয়েদের আত্মজীবনীর প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে সমালোচক অলোক রায় বলেছেন—

> "পৃথিবীতে সব দেশে দেখা যায়, আত্মকথা রচনায় মেয়েদের স্থান সর্ব্বোচ্চ। রাসসুন্দরী থেকে বিনোদিনী কেউ-ই পেশাদার সাহিত্যিক ছিলেন না, কিন্তু সরলতা, অন্তরঙ্গতা প্রত্যক্ষতাগুণ তাঁদের রচনায় যতটা দেখা যায়, পন্ডিত বহুদর্শী, বৃহৎ কর্মকান্ডে যুক্ত পুরুষদের রচনায় যতটা দেখা যায়, পণ্ডিত বহুদর্শী, বৃহৎ কর্মকাণ্ডে যুক্ত পুরুষদের রচনায় তাঁর সন্ধান মেলে না,"

এর কারণ সম্ভবত এই যে, যে কোনো দেশেই নারী, পুরুষের পদানত। সেই পদ সরিয়ে পদক্ষেপ নিতে গিয়ে প্রথমেই সে বহুধাবিভক্ত হতে পারেনি। তার চেষ্টা, ইচ্ছা—সবই ছিল একরৈখিক। তখন জ্ঞানের হাজারো মুক্তো আহরণের চাইতে অন্তরের মুক্তিই তার প্রধানতম উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছিল সে কারণেই সহজাত সারল্যে নারীর আত্মচরিতগুলিতে সময় এবং সমাজের এক নির্ভেজাল, অকপট প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

ঠিক এ কারণেই 'অর্ধেক আকাশ' এর আত্মজীবনীর আকর্ষণ আমাকে তাড়িত করে। বৃহত্তর রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিত অপাংক্তেয় মেয়েদের এই আত্মজীবনীগুলি হাতড়ে খুঁজে পেতে ইচ্ছা করে ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখ কথাদের। কেমন ছিল আমার মা-দিদিমা বা আরও দূর অতীতের অন্দরমহল— কেমন ছিল তাঁদের বেঁচে থাকার ধরন!— এ কৌতুহল নিবৃত্তির একটি বিস্বস্ত ঠিকানা হতে পারে মেয়েদের লেখা আত্মজীবনীগুলি।

সময়ের স্রোতে জীবন এগিয়ে চলে। মেয়েদের আত্মজীবনীর প্রতি আকর্ষণ আর অন্বেষণ জারি থাকে। কর্মক্ষেত্রে কথায় কথায় জানতে পারি শ্রদ্ধার্হ ইন্দ্রানীদির কাছেও একটি গুপ্তধন আছে । জীবনীটি ওনার মা, সুজাতা ঘোষের লেখা— "ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি।"

পরের ধনে লোভ না দিয়ে পারলাম না। হস্তগত করার পর ইন্দ্রানীর ভূমিকা আর ব্লার্বে লেখা তথ্যসূত্র পড়েই ক্ষুধার্ত গ্রন্থকীটের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম 'ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি'র পাতায়।

সুজাতা ঘোষ। জন্ম ১৯২৯ সাল। মনে মনে হিসাব কষে নিই— পাড়ি দিই ১৯২৯-এ।

আত্মকথা শুরু হয় বাপির স্কুলযাত্রার বর্ণনা দিয়ে। বনেদি বাড়ির মেয়ে—বড়ো হয়ে ওঠা নিঃসন্তান পিসির (মানা) কাছে। জীবনে দুবার বাপির ঠিকানা বদলের সময় আসে। কিন্তু জীবন তাঁকে মানার সঙ্গেই বেঁধে রাখে। বনেদি বাড়ির ঐতিহ্য থাকলেও অর্থ ছিল না। দারিদ্র্যের কাছে মেধাবী ছাত্রী বাপির বিদ্যাচর্চা বারে বারে হোঁচট খায়। কিন্তু অন্যের বই নিয়ে একেবারে স্বচেষ্টায় ম্যাট্রিকপাশ করে, ইতিহাসে অনার্স নিয়ে আশুতোষ কলেজের চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়া বড়ো কম কথা নয়। তাই বাপির কাছে পাঠকের প্রত্যাশা বাড়তে থাকে। আসলে বাপির জন্ম, বেড়ে ওঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়-সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। স্বাধীনতার লড়াই, দেশভাগ, বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, গান্ধীর হত্যা সাধারণ মানুষ হিসাবে একের পর এক ঘটনার সাক্ষী তিনি। সেই সঙ্গে তিনি-ই আবার ইতিহাসের ছাত্রী। তাঁর কাছ থেকে তাঁর সময়ের কথা জানার আগ্রহ তাই বেড়ে চলে ক্রমশ। নিজের পারিবারিক ইতিহাস বর্ণনা করার সময়ই ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্রেরা ঢুকে পড়েন। সেই সঙ্গে ঢুকে পড়ে সমকালীন যাপনের মণ্ডিত যাপনমালা। এই সময়ের ঘটনা নিঃসন্দেহে লেখিকার শ্রুতি-সংগ্রহ কিন্তু গল্প বলার চমৎকারিত্বে সঙ্গত এবং সুপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

বাপির বিপর্যস্ত শৈশব, কৈশোর, দারিদ্র্যপীড়িত জীবনধারণ—সেইসঙ্গে পরীক্ষা, প্রস্তুতি, আশা হাতাশা, রোগ আরোগ্য এবং অবশেষে ভালোবাসার— ভরসা করার মানুষকেই জীবনসঙ্গী হিসাবে পাওয়া— এই সমস্তই তাঁর জীবনকে, যাপনকে ব্যক্তিত্বকে সমকালীন সময়ের মানচিত্রে ব্যতিক্রমী করে তুলেছে ব্যক্তির ভিতর স্বতন্ত্রের বোধ না জন্মালে কোনো সার্থক আত্মজীবনী লেখা প্রায় আসম্ভব। সুজাতা ঘোষের ব্যক্তিত্বে সেই স্বাতন্ত্রের স্পর্শ ছিল। 'ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি'র প্রথম পর্বেই সে কথা অনুভূত হয়।

আত্মজীবনীর দ্বিতীয় পর্ব মানে বাপির সংসার জীবন কথা। নিজের পছন্দের মানুষের সঙ্গে বিয়ে শুধু নয়, বাপি বিয়ের প্রথমেই পেয়ে যায় স্বামীর কর্মস্থলে একেবারে নিজস্ব একটা সংসার। বেদনার বিষয় এই যে, শ্বশুরবাড়ির মানুষজন বাপিকে সহজে মেনে নেন না। এই অবজ্ঞা নিঃসন্দেহে কষ্টকর। তবে জীবন তাঁকে সবটা বঞ্চিত করেনি। নিজের মতো করে আপন কর্তৃত্বে সংসার করার সুযোগ সে কালের কটা মেয়েরইবা হতো। বাপির জীবন এক্ষত্রেও ব্যতিক্রম। জীবনের এই কাঙ্ক্ষিত পর্বে এসে বাপির মধ্যে ছোটো ছোটো করে একধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। দিন বয়ে যায়। কিন্তু জীবনের ভালো-মন্দ, সাফল্য-ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে সেই ক্ষোভের শোধন হয়না বরংতা বেড়েই চলে। বেড়ে চলে দাবানলের মতো। বিবাহ পূর্ববর্তী জীবন বর্ণনায় যে সময়-সমাজের স্মৃতিচিত্র উঠে এসেছে, বিবাহপরবর্তী জীবনে যেন খোলা হাওয়ার স্পর্শ পাওয়া যায়না। বয়স যত বাড়তে থাকে জীবন-পরিসর ততই সীমাবদ্ধ হতে শুরু করে। বাপির মন আর জীবন জুড়ে যে অসাধারণ উপাদান ছিল এক অনির্বাণ ক্ষোভাগ্নিতে দগ্ধ হতে হতে তা যেন হয়ে উঠল কেবলই একটি সাধারণ মেয়ের জীবনকাহিনি। সাধারণত্ব একটা গুণ, সাধারণভাবে বেঁচে

থাকার মধ্যেও আছে এক নারীর গরিমা। কিন্তু আক্ষেপ এখানেই ইতিহাসের মেধাবী ছাত্রীটি একটি ঐতিহাসিক সময়ের সাক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে জানা গেল না সমকালীন সমাজ রাজনীতির নিজস্ব কোনো ধারাভাষ্যে। নারীর দুঃখগুলো ঢোক গিলে জীবন পোহালেও বাপির জীবনী থেকে তৎকালীন নারীর আবস্থান বা নারীর সমস্যা সম্পর্কে তেমন কিছুই পাওয়া গেলনা।

আত্মজীবনীর ভিতর একজন ব্যক্তিগত মানুষের জীবন বলিষ্ঠ রেখায় ফুটে উঠবে একথা ঠিকই, কিন্তু জীবন তো সময়-নিরপেক্ষ নয়; সমকালীন সমাজের প্রেক্ষিতে জীবনীকারের দর্শন, যুক্তি, বোধ, বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই আত্মজীবনীর মূল্য তথা গুরুত্ব নির্ধারিত হয়। বস্তুত আত্মজীবনীর দুটি স্তর। একটি স্তরে থাকে ব্যক্তিগত যাপনচিত্র, অন্যস্তরে থাকে সমকালীন যুগচিত্র। 'ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি'-তে এই দুই স্তরের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছে।

এখন নির্মাণের প্রসঙ্গে আসা যাক। আত্মজীবনীর শুরুতেই গদ্যপাঠের একটা আরাম পাওয়া যায়— যার কারণ একদিকে ভাষায় সারল্য অন্যদিকে গল্প বলার কৌতুহলী ভঙ্গি। সাধারণভাবে আত্মজীবনী উত্তম পুরুষেই লেখা হয়ে থাকে। নিজেকে নিজের জীবনের গল্প থেকে দূরে সরিয়ে, প্রথম পুরুষে নিজেরই জীবনকথা বলার কৌশলটি কিন্তু বেশ অভিনব। জীবনীকার 'বাপি' নামের আবডালে অনেক ব্যক্তিগত, কঠিন কথা প্রকাশ করার সুযোগটি সুচারু ভাবেই তৈরি করে নিয়েছেন। সুজাতা সুমেধায় নিজেই হয়ে উঠেছেন নিজের জীবনের ঔপন্যাসিক।

আজকের মেয়েদের স্বাধীনতা অনেক উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত সংগ্রামের যৌথ ফসল। যাঁরা সামনে এসে পথের কাঁটা সরিয়ে ছিলেন, তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। কিন্তু যাঁরা আড়ালে থেকে মেয়েদেরকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন তাঁরা অন্তরালেই থেকে গেছেন। অনেকেই এমন ছিলেন যাঁদের চিন্তা চেতনা-বিকশিত হয়েছে নিতান্তই পরিবার বা পরিচিতি গণ্ডির মধ্যে। তাঁদের প্রচার ছিল না। কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টার মূল্যও কিছু কম নয়। সেই সময়ে মেয়েদের সচেতন হয়ে ওঠার জোয়ারে এই সমস্ত ছোটোছোটো আলোড়ন নিশ্চয় নিভৃতে নীরবে কাজ করেছিল। 'ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি' প্রসঙ্গেও কথাটি প্রযোজ্য। আত্মজীবনীটির ভূমিকাতে জীবনীকার-কন্যা অবশ্য জানিয়েছেন তাঁর মায়ের জীবনীটি 'গড়পড়তা এক গৃহবধূর প্রাণের কথা'। তবে প্রতিটি বিপ্লবের পেছনে যে নানা মাপের নিঃশব্দ মোকাবিলা থাকে তা অনেকসময়ই বিদ্রোহের কোলাহলে হারিয়ে যায়। মেয়েদের আত্মজীবনীগুলি সেই সব বিদ্রোহের নেপথ্য কাহিনি। সুজাতা ঘোষের 'ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি'ও তার ব্যতিক্রম নয়। মনোজ্ঞ সমালোচক যশোধরা বাগচী যে কারণেই বলেন— "মেয়েদের আত্মজীবনীগুলিতে আমরা খুঁজে পাই প্রবল বাধার মধ্যে মেয়েদের সক্ষমতার স্বরূপ। মানবীবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এই স্বকথিত জীবনীগুলি অনেকক্ষেত্রে উপন্যাসের চাইতেও বেশি দামী।"

তথ্যসূত্র:

১। অলোক রায়, 'আত্মকথার স্বরূপ সন্ধান', 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা' আত্মজীবনী সংখ্যা ২০১৪): পৃ. ১৩
২। যশোধরা বাগচী, "কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে", 'স্মৃতিমঞ্জুষা' প্রিয়বালা গুপ্তা: দ্র. রঞ্জন গুপ্ত (সম্পা) ১ম সং, কলকাতা, দে'জ, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৮

উচ্ছ্বাসে গা ভাসালাম কিছুদিনের জন্যে কিছুটা স্থায়ীভাবে আমাদের উৎসাহের অন্তর্ভুক্ত হলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত; তারই অসমমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত থেকে অচিন্ত্য আহরণ করল তার *অমাবস্যার* স্তবক বিন্যাস;"[১২] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই 'বোঝাপড়া'র প্রচেষ্টা *প্রগতি*র দিক থেকেও এসেছিল। লোকে যাকে 'রবীন্দ্রবিদ্রোহ' আখ্যা দিয়েছিল। আর *কল্লোল*ও ছিল রোমান্টিসিস্‌মের মোহ মাখানো সাহসী যুগ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের বন্ধুতার আহ্বান আশীর্বাদকে মাথায় নিয়ে যাঁরা একটু প্রথাগত চিন্তার বাইরে নিজের মতো করে সাহিত্যচর্চা করতে চাইলেন। এখানে রবীন্দ্রবিরোধিতার কোন প্রশ্নই ছিল না। কারণ অচিন্ত্য' তো স্বীকার করেইছিলেন যে "আমাদের এই গুপুরি নারকেল ধান-পাটের দেশকে যিনি বিশ্বের মানচিত্রে চিত্রিত করেছেন সেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরিচায়ক" আর যে বুদ্ধদেবের 'রবীন্দ্রনাথ বিনা' এক মুহূর্তও চলে না; তিনি পেলেন 'রবীন্দ্র-বিরোধী' তক্‌মা। এরপর সংবাদ পত্রের হলুদ সাংবাদিকতা যে কতটা ন্যাক্কারজনক হতে পারে তা কারোর অজানা নয়। প্রগতিশীল লেখক সম্মেলন-এ মুলকরাজ ও সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্যতম সভাপতি বুদ্ধদেবের ইংরেজি বক্তৃতার অন্যতম এই বক্তব্যের লাইন— "The age of Rabindranath is over" অমৃতবাজারের শিরোনামে উঠে আসে।" ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ, ব্যথিত বুদ্ধদেব। তবে এই ভুলবোঝাবুঝির অবসান অচিরেই হয়েছিল আর বুদ্ধদেবও আজীবন স্নেহধন্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথের। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতি কোন বিদ্রোহ নয়। সেই বিদ্রোহ ছিল এক নতুন যুগের নবজাগরণ; অচিন্ত্যরও মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির পথের সমাপ্তি রচনা করেননি কখন। তাঁরই লেখার চর্বিত চর্বন হবে কেন আধুনিক সাহিত্য?—সে তো হীন অনুকৃতির নামান্তর। তাই "পত্তন করতে হবে জীবনের আরেক পরিচ্ছেদ।" তাঁর সেই বিদ্রোহ বাণী; সমগ্র কল্লোলের লেখকদের মনের কথা—

"পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর!

... ...

উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতেছি নব-নর-জন্ম-সম্ভাবনা;
অক্ষয়তুলিকা মোর হস্তে যেন রহে অনলস,
ভবিষ্যৎ বৎসরের শঙ্খ আমি—নবীন প্রেরণা!'

মল্লিক এবং আরও কিছু সুহৃদদের সঙ্গে আলোচনা করে জোড়াসাঁকোর কমল বসুর বাড়িতে 'ব্রাহ্ম সভা' (৬ই ভাদ্র, ১২৩৫, ইংরেজির ২২ আগস্ট, ১৮২৮) প্রতিষ্ঠা করলেন। কয়েক দু'য়েক পর 'ব্রাহ্ম সভা'র সদস্যসংখ্যা ক্রমবর্ধমান হল। নাম পরিবর্তিত হয়ে তখন তা হল 'ব্রাহ্ম সমাজ'। চিৎপুর রোডে 'ব্রাহ্ম সমাজ'-এর নবনির্মিত গৃহে ১১ মাঘ, ১২৩৭ (ইং-১৮৩০) শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রহ্মের উপাসনা ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গৃহ প্রবেশ হয়। ফিরিঙ্গি, মুসলমান বালকেরা এখানে পার্সি ও ইংরেজিতে 'স্তবগান' করত। অর্থাৎ সব ধর্মের মঙ্গলকর ব্যাপারগুলিকেই ব্রাহ্ম ধর্ম প্রাধান্য দিয়েছিল। তারাচাঁদ চক্রবর্তী যিনি 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর নেতা ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হলেন। ব্রাহ্ম সমাজ তৈরি হবার সময় সাপ্তাহিক সভা প্রতি শনিবার সন্ধ্যেবেলা বসতো। কিছুকাল পরেই এই সভা বুধবার অনুষ্ঠিত হতে লাগল। এই ধারা এখনও শান্তিনিকেতনে উপাসনা গৃহে বা ব্রাহ্ম মন্দিরে চলে আসছে। এই সভার তিনটি অংশ ছিল- (১) তেলুগু ব্রাহ্মণদের দ্বারা বেদপাঠ (২) সাধারণ মানুষদের জন্য উপনিষদ পাঠ (৩) ধর্মীয় গানের পরিবেশন।

রামমোহনের Trust Deed থেকে জানতে পারি, সেই সময় শুধু ব্রাহ্মণ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেই একচেটিয়াভাবে বেদপাঠ হত। কলকাতায় বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের একমাত্র রক্ষক ছিল গোঁড়া তেলুগু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এবং তাঁরা অব্রাহ্মণদের সামনে বেদ পাঠ করতে চাননি। অপরদিকে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্ম সমাজের বাকি সদস্যদের এতে কোনও সমস্যা ছিল না। নতুন চার্চ (New Church) ও এই ভেদাভেদের বিরুদ্ধে ছিল। আর রামমোহনও চাইতেন যেন অব্রাহ্মণদের এবং মুসলমান এমনকি খ্রিস্টানদেরও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সামনেই বেদ উপনিষদ এর পাঠ এবং এর ব্যাখ্যা যেন ঠিকঠাক মতো করা হয়। এই গুরুদায়িত্ব পালন করতেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন পমুখ। কুসংস্কারহীন জ্ঞানী পণ্ডিতেরা।

এখানে 'ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা বেশ কিছু বছর আগে এবং সমসাময়িক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাময়িক পত্রিকার কথা বলা বাঞ্ছনীয়। 'সংবাদ কৌমুদী' (১৮২১)-র প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রামমোহন রায়, প্রকাশক তারাচাঁদ দত্ত আর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রামমোহন রায় এর লেখকও ছিলেন। সতীদাহের কুফল সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করতেন 'সংবাদ কৌমুদী'র পাতায়। আবার ভবানীচরণ ছিলেন হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা তাই তিনি এই পত্রিকা থেকে সরে দাঁড়ালেন এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২) প্রকাশ করলেন। এক দিকে হিন্দুদের সমর্থনে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রচার ও প্রসার বেড়েই চলল, অন্যদিকে 'সংবাদ কৌমুদী'-কে হিন্দুসমাজ সমর্থন করল না। সুতরাং অত্যুজ্জ্বল এই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেল। ১৮২৯ এ প্রকাশিত 'বঙ্গদূত' পত্রিকাটিও কিন্তু হিন্দু সংস্কারবাদীদের একটি উচ্চমানের প্রয়াস ছিল। রামমোহন রায় ও তাঁর অনুসারীরা এর পরিচালন সমিতিতে ছিলেন- "এদেশে ইংরেজরা জমির মালিক হয়ে বাস করুক, নীলের চাষ চলুক, ইত্যাদি রামমোহন-দ্বারকানাথ প্রমুখ প্রগতিধর্মী ব্যক্তিদের ('কলোনিজেশন' নামে পরিচিত) মতবাদের প্রধান বাহক ছিল 'বঙ্গদূত'।" (পৃষ্ঠা- ১১৭, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা : গোপাল হালদার)। কিন্তু তখন সাময়িকপত্র পর্ব ক্রমাগত শেষ হয়ে আসছে এবং সংবাদপত্রের ক্রেতারাও স্থির করে নিচ্ছেন তাঁরা কোন মতবাদের দিকে গুরুত্ব দিয়ে

১৬. স্মৃতি বিস্মৃতির আলো-অন্ধকারে নদী ও সমুদ্র : রবীন্দ্রনাথ সেন, ৩০শে নভেম্বর : কবিতাভবন বার্ষিকী, তৃতীয় সংস্করণ, ১লা বৈশাখ ১৩৯৬, পৃ. ১৩৫

১৭. মুখবন্ধে মৃত্যু, পরিণামে পুনরুজ্জীবন : আবুল মান্নান সৈয়দ—একবিংশ আধুনিকতাবাদ ও বুদ্ধদেব বসু, পৃ. ১৩১

১৮. *কল্লোল যুগ* ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পৃ. ১৬৫

অনুপ্রেরণার অন্ত নেই। বল্লেন—'আপনিই তো একাধারে ফোর আর্টস। চিত্র, সংগীত, সাহিত্য, অভিনয়।" নম্রতায় বিমর্ষ হয়ে হাসল গোকুল। বললে, "আসুন আপনারা সবাই *কল্লোলে*। *কল্লোলকে* আমরা বড়ো করি। দীনেশ এখন দার্জিলিঙে। সে ফিরে আসুক। আমাদের স্বপ্নের সঙ্গে মিশুক আমাদের কর্মের সাধনা।"[৩] *কল্লোলের* সেই আহ্বান, সেই উত্তপ্ত আন্তরিকতা কোন 'মামুলি শিষ্টাচার' ছিল না। তাই প্রথম কল্লোলের সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ আর সহ সম্পাদাক শ্রী গোকুল চন্দ্র নাগ তাঁদের সাধের *কল্লোলকে* নিজেদের নামের আড়ালে লুকিয়ে না রেখে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে মহীরুহতে পরিণত করার অনুমতি নয়, যেন আকূতি জানিয়েছিলেন অচিন্ত্যকুমারকে। তাই *কল্লোল* বল্লেই চোখ বুজলেই এক নিঃশ্বাসে যাঁর নাম প্রথমেই মনে আসে তিনি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আর তাঁর সঙ্গে একই সঙ্গে উচ্চারিত হয় বুদ্ধদেব বসু'র নামও অনায়াসেই। গোকুল নাগের 'অচিন্ত্যকুমার' নামক জহুরীকে চিনতে ভুল হয়নি। তাই দীনেশরঞ্জন আর গোকুল নাগের 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া'র সেই যে পসরা *কল্লোল* 'বুকের মাঝে বিশ্বলোকে'র কতটা 'সাড়া' পেয়েছিল তা সময়ই জানে। এ তো শুধু 'পত্রিকা' হিসেবে সীমাবদ্ধ রইল না হয়ে গেল 'যুগ'—*কল্লোল যুগ*।

প্রসঙ্গে আসি। বুদ্ধদেব বসু আর অচিন্ত্যকুমারের মানসিকতার অভূতপূর্ব মিল তাঁদের কাজের উৎকর্ষতার মধ্যে প্রমাণিত। যেন পরস্পরের পরিপূরক। প্রেমেন্দ্র মিত্রের অবদানও এতে কম নয়। তাই তো বুদ্ধদেবের কালজয়ী 'কবিতা' পত্রিকা'র যুগ্ম সম্পাদকের আসনেও প্রেমেন্দ্র মিত্র অদ্বিতীয়ত-ই। তবে বেশ কিছুটা সময় অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের ফসল *কল্লোল-প্রগতিকে* আরো ঐশ্বর্য্যশালী করেছিল। যেন এঁদের অনিবার্য উপস্থিতি ছাড়া প্রগতি অচল—*কল্লোল* অন্ধ। তখন *কল্লোলের* রমরমা—বিজয়পতাকা সদর্পে উড্ডীন। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনের কথায়—যে সকল বীর আমাদের ঘর-দোর জোর করে খুলে দেওয়ার জন্যে লেখনী নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, তন্মধ্যে *কল্লোলের* লেখকেরা সর্বাপেক্ষা তরুণ ও শক্তিশালী। ...এই সকল বলদর্পিত মর্মবাণ লেখকদের পদভারে প্রাচীন জরাজীর্ণ সমাজের অস্থিপঞ্জর কেঁপে উঠবে। কিন্তু আমি এঁদের লেখা পড়ে কত যে সুখী হয়েছি তা বলতে পারি না। আমাদের মনে হয় ডোবা ছেড়ে পদ্মার স্রোতে এসে পড়েছি—যেন কাগজ ও সোলার ফুল-লতার কৃত্রিম বাগান ছেড়ে নন্দনকাননে এসেছি..."[৪] ঠিক এই সময়েই অচেনা বুদ্ধদেবের সঙ্গে পরিচয় অচিন্ত্যকুমারের 'যৌবন পথিক' কবিতার মাধ্যমে—

Scanned with OKEN Scanner

অচিন্ত্য'র পাঠক তথা বাংলাসাহিত্য অবশ্যই বঞ্চিত হল বলাবাহুল্য। বলা যায়—'আইন' এর পথে সুনিশ্চিত চাকরির সুরাহা একটা হয়ে উঠলেও 'ল' এর প্রতি 'লভ' এর খামতি করে অচিন্ত্য যদি শুধু সাহিত্যকে আঁকড়ে থাকতে পারতেন *কল্লোল যুগ* আরো বহু বছর সদর্পে চলত। তবে জীবনে চলার পথে কী বুদ্ধদেব, কী অচিন্ত্য অর্থনৈতিক ক্লেশ তাঁদের বড়ই জ্বালাতন করে গেছে অহরহ। তাই স্থায়ী ভবিষ্যৎ-এর নিশ্চিত হাতছানি উপেক্ষা করাও বুদ্ধিমানের কাজ ছিল না। তবে অচিন্ত্যের সাহিত্যচর্চা কখন থেমে থাকেনি স্বতন্ত্র্য সাহিত্যিক হিসেবে। দেখা যাচ্ছে বুদ্ধদেব তাঁর *কবিতা* বের করছেন বাংলার ১৩৪২ বা ১৯৩৫ সালে। কিন্তু যে 'বন্ধুমহল' এর সহায়তায় তিনি তাঁর *কবিতা*কে দাঁড় করিয়েছিলেন সেখানে কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের কোন উল্লেখ পাই না। প্রকৃতপক্ষে *প্রিয়া ও পৃথিবী* (১৯৩৩)র পর বেশ কিছু বছর তাঁর সৃষ্টি কিছুটা হলেও কমে গিয়েছিল। সে কি তাঁর উচ্চপদস্থ চাকুরি হেতু? তারপর আবার সৃষ্টিতে অবিচল অচিন্ত্য। কিন্তু আমার প্রবন্ধের প্রসঙ্গ যেখানে সীমাবদ্ধ সেই প্রেক্ষিতে বলা যায় ঐ ৩৩ এর পর থেকেই অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব এই রসায়নটা ক্রমাগত ক্ষীণ হয়ে গেল। *কল্লোল*-এর শেষ বছর অচিন্ত্যকুমার *বিচিত্রায়* পঞ্চাশ টাকা মাইনের প্রুফ-এডিটরের চাক্‌রী নিলেন। তার জন্য *কল্লোল* এর 'আড্ডার' কোন খামতি ছিল না তাঁর। বন্ধুমহল—বরাবর অচিন্ত্য ও বুদ্ধদেব উভয়কেই সমৃদ্ধ করেছে। *কল্লোল*এ আড্ডার রেশ সারাজীবন বুদ্ধদেবের 'কবিতাভবন'-এও সঞ্চারিত হয়েছিল। সেই ২০২ রাসবিহারি এভিনিউ'এর বিখ্যাত আড্ডা আর হাসির রোল নাকি গড়িয়াহাটের মোড় থেকে শোনা যেত। উল্লেখযোগ্য— "আসলে *কবিতা*কে তিনি দীর্ঘস্থায়ী করতে পেরেছিলেন নিজেরই 'ব্যক্তিত্বের বলে।' বুদ্ধদেবের অন্যতম ভরসা হিসেবে 'বন্ধুবলে'র কথা উল্লেখ করলেও একথা সত্যি *কবিতা*কে কেন্দ্র করে তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তার জন্যই অনেক বন্ধুকে হারাতে হয়েছে। *কবিতা*র বন্ধুর চলার পথে সঙ্গী ও সহযাত্রীদের সঙ্গে কম বিরোধিতা করতে হয়নি তাঁকে। যদিও এইসব অপ্রত্যাশিত ছোটখাটো সাহিত্যিক ঘটনাকে কোনো সময় বেশি আমল দেয়নি;"[১৪] অচিন্ত্য যেমন কত নতুন মুখকে কল্লোলে এনেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই; বুদ্ধদেবও নতুন প্রতিভাদের বরাবর *কবিতায়* ঠাঁই দিয়েছেন; তাঁদের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। এই প্রতিভা অন্বেষণের ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখতে উভয়েই সিদ্ধতম পুরুষ ছিলেন।

এখানে দুজনের স্বভাবের মধ্যে একটা অদ্ভুত কৌতুকপ্রিয়তা লক্ষণীয় না উল্লেখ করে পারছি না। আর এই মজা হয়ত জমত ভাল দুই-বিচক্ষণ প্রতিভা একসঙ্গে হলে; বেশি করে। ছোট্ট একটা ঘটনা উল্লেখ করি এখানে। *কল্লোল* এর লেখিকা

Scanned with OKEN Scanner

কল্লোল। হোক্ প্রতিবাদ, সমালোচনা, চিঠি লেখালিখি।—এটাই তো বাঞ্ছনীয়—আর তবেই তো লেখকের সার্থকতা, সেই যুগের সার্থকতা। আর এই প্রতিভা বাছাইয়ের মূল কৃতিত্ব অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের-ই। তাই অচিন্ত্য ছাড়া হয়ত বুদ্ধদেব পরিপূর্ণ নন।

অন্যদিকে প্রগতিকেও বাঁচিয়ে রাখার অদম্য চেষ্টা বুদ্ধদেবের। শিকড়ের টান যে ঢাকা!—*প্রগতি*কে টিকিয়ে রাখতে তাই মরিয়া তিনি। অর্থের সমস্যাটাই সেখানে প্রধান। বিষ্ণু দে, নরেন্দ্রনাথ দেব, অপূর্ব চন্দ, রাজশেখর বসু প্রমুখরাও প্রগতিকে বাঁচিয়ে রাখতে অর্থকরী সাহায্য সাধ্যমত করতেন নিয়মিত-ই। বিষ্ণু দে'র এক স্মৃতিচারণায় পাই—"প্রগতির জন্য চাঁদা তুলে পাঠাতুম ঢাকায় বুদ্ধদেবের কাছে।"[৯] অচিন্ত্যকুমারের চেষ্টারও ত্রুটি ছিল না *প্রগতি*কে চালিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে। তবুও বেশি দিনি স্থায়ীত্ব পায়নি *প্রগতি*। তার প্রধানতম কারণ হয়তো বুদ্ধদেবের ঢাকা-কলকাতার অস্থায়ী জীবন। বন্ধু ও পরমাত্মীয় কবি অজিত দত্ত-ও সম্পাদনার কাজে আপ্রাণ সহায়তা করেছিলেন, অর্থ, কায়িকশ্রম—কোন কিছুরই ত্রুটি ছিল না। তবুও, নিয়মিতভাবে সম-মনস্ক মানুষদের একত্রিত ভাবে যুক্ত হবার জন্য বেশ কিছুটা সময় দাবী করতে হয়; ঠাঁই নাড়া-নাড়িতে তা ব্যহত হয় বৈকি! তবুও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অচিন্ত্য ঢাকাতে গিয়ে সেখানে কাজ শেষ হলে বন্ধু বুদ্ধদেবকে মানসিক সমর্থন দেবার জন্য সেই 'সাতচল্লিশ নম্বর পুরানো পল্টন' এ এসে হাজির হন। বিস্মিত, আপ্লুত বুদ্ধদেব। আরো বন্ধু'দের নিয়ে জমে ওঠে প্রগতির আড্ডা। Intellectualsদের আড্ডা—এর মধ্যে দিয়েই বেরিয়ে আসবে হয়ত মহৎ কিছু সৃষ্টি। ক্রমে দল হল ভারি। "যুবনাশ্বরা মণীশ ঘটক, তাঁর ভাই সুধীশ ঘটক, আর অনিল ভট্টাচার্য, ছবির জগতের আলফাবিটা—আর সর্বোপরি ভৃগু। নবরত্নের সভা গুলজার হয়ে উঠলো। মনে হল যেন বোহিমিয়ায় এসে বাসা নিয়েছি।"[১০] এই সময়ই যেন বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমারের 'নিভৃততম' হয়ে উঠেছিলেন। সাবেকী বাঙালীদের সেই উঠোন, পিঁড়িতে বসে একত্রে স্নান, খাওয়া দাওয়া অল্প বয়সের অনিয়ম, বুদ্ধদেবের দিদিমার স্নেহ-ছায়ায়, আহ্লাদের স্পর্শ দু'জনকে আরও নিবিড়-গভীরতায় মগ্ন করে দিয়েছিল এক পক্ষ কাল। মশারির তলায় দুজনে গল্প বা সাহিত্য-আলোচনা করেই বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিতেন কিঞ্চিৎ অসমবয়সের উদীয়মান দুই প্রতিভা। তাঁদের জন্মের সালের একটু ফারাক ছিল বটে। অচিন্ত্যকুমার বছর পাঁচেকের বড়োই ছিলেন বুদ্ধদেবের থেকে। অচিন্ত্যের জন্ম ১৯০৩ আর বুদ্ধদেবের ১৯০৮'এ। জন্মের স্থানটি যদিও কাকতালীয়ভাবে সেই তৎকালীন ব্রিটিশ

Scanned with OKEN Scanner

কালের স্রোতে *প্রগতি-কল্লোল* যুগের অবসান হ'ল বটে। সেটা সাময়িক। তবে 'চিরবন্ধু চিরনির্ভর' অচিন্ত্যের বুদ্ধদেব বা বুদ্ধদেবের অচিন্ত্য ইতিহাসসম্মত এক যুগের সাধন হয়ে রইল। প্রবন্ধের শুরুর মত, সমাপ্তিতেও বুদ্ধদেবের, অচিন্ত্যকে লেখা চিঠির অংশ দিয়ে শেষ করতে চাই—"... অলস কৌতুহলবশত নয় কেবল—আপনাকে বন্ধু বলে হৃদয়ে গ্রহণ করেছি, তাই। আপনার প্রতি সুখ দুঃখের সঙ্গে আমি নিজেকেও ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বিবেচনা করি।" বয়োঃজ্যেষ্ঠ অচিন্ত্যের প্রতি এই 'আপনি' সম্বোধনের বন্ধুত্ব ক্রমে বয়সের বাধাকে উপেক্ষা করে 'ভাই অচিন্ত্য' আর 'তুমি'তে পরিণতি পেয়ে কবে যেন কোমল-পেলবতায় দৃঢ়তর হয়ে উঠেছিল যা সত্যিই অনিবার্য ছিল।

তথ্যসূত্র

১. *কল্লোল যুগ* ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পৃ. ১৬৮
২. *কল্লোল যুগ* ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পৃ. ৫
৩. *কল্লোল যুগ* ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পৃ. ৬
৪. *কল্লোল যুগ* ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পৃ. ১২৪
৫. *কল্লোল যুগ* ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পৃ. ১২৫
৬. *আমার ছেলেবেলা* ঃ বুদ্ধদেব বসু, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড-১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১১০
৭. *আমার ছেলেবেলা* ঃ বুদ্ধদেব বসু, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড-১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ১১
৮. *কল্লোল যুগ* ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পৃ. ১৪৫
৯. *একবিংশ* : আধুনিকতাবাদ ও বুদ্ধদেব বসু, পৃ. ১৮৮
১০. *কল্লোল যুগ* ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পৃ. ১৬২
১১. *আমার যৌবন* ঃ এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৬
১২. *আমার যৌবন* ঃ এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২০
১৩. *কল্লোল যুগ* ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পৃ. ১৮৭
১৪. *কল্লোল যুগ* ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
১৫. *আমার যৌবন* ঃ এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩৫

Scanned with OKEN Scanner

সাহিত্যেরও এক যুগচিহ্ন মাইল স্টোন—যার একটা লাইনও বাদ চলে গেলে রসভঙ্গ হয়। আর প্রথাগত অশ্লীলতার সমস্ত ছুতমার্গের উর্ধ্বে ছিল তাঁদের সাহিত্য। আর সেটার প্রথম প্রমাণ বোধহয় ঐ প্রথমেই উল্লিখিত সেই বুদ্ধদেবের *রজনী হল উতলার* প্রকাশ পাওয়া অচিন্ত্যের হাতেই সেটা বোঝা যায়।

বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র—কল্লোলের তিন স্তম্ভ—এমন-ই অভিন্ন হৃদয় ছিলেন প্রথম দিকে যে—"প্রথম যৌবনেই স্থির করেছিলেন তাদের প্রথম কবিতার বইয়ের নাম হবে তাঁদের তিনজনের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে—এইভাবে জন্ম নিল *বন্দীর বন্দনা, প্রথমা* ও *অমাবস্যা*"[৬] তবে প্রেমেন্দ্র চলচ্চিত্র বিষয়টির দিকে মনোনিবেশ করায় কিংবা হয়ত স্বতন্ত্র্য সাহিত্যিক হিসেবে বেশি গুরুত্ব পাওয়ায়, ক্রমে বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য আর *কল্লোল* সমোচ্চারিত হয়েছিল। ক্রমে এঁরা সকলেই *কল্লোলে* ছাতার অন্তরালের লেখক না থেকে অসম্ভব প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক;—মৌলিক—স্বতন্ত্র্য ধারার উল্লেখযোগ্য ইতিহাস সৃষ্টিকারি মাইলস্টোন হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। *কল্লোলের* শেষ আর *কবিতার* শুরুতে ক্রমাগত বুদ্ধদেব তাঁর পরিচিত বন্ধুত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, অজিত দত্ত পেরিয়ে ক্রমে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখদের নিয়েই এগিয়ে চলতে শুরু করলেন—"এর মধ্যে তাঁর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে করি না। কবিতায় ও বুদ্ধদেবের অন্তঃতাড়নাই তাঁকে উচ্ছ্বাসের পশ্চাদ্ধাবন ছাড়িয়ে ক্রমশ সংক্ষিপ্ত সংহতি সংস্কৃতির দিকে আকর্ষণ করে।"[৭] তাই এই ধরনের সাহিত্যিকদের গোষ্ঠীবদ্ধতা থেকে কখন কখন বিভক্ত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। শুধু কল্লোলের লেখক কিংবা শুধু প্রগতির লেখক নন; বুদ্ধদেব-অচিন্ত্যের 'আমিত্বে'র তাগিদের দরকার অবশ্যই ছিল। বন্ধুতা—বন্ধুত্বের জায়গাতেই রইল—কিন্তু প্রয়োজন ছিল নিজেদের এককভাবে, নিজস্বতার উপর মনোনিবেশ বা মনঃসংযোগের। দু'জনেই উজ্জ্বলভাবে দু'জনার মনের মধ্যে সদর্পে উপস্থিত ছিলেন; তাই তো খ্যাতির উচ্চাসনে, জনপ্রিয়তার মধ্যগগনে যখন এই দুই মহীরুহের আত্মোপলব্ধির প্রকাশ ঘটে *কল্লোল যুগ, আমার যৌবন* বা *আমার ছেলেবেলায়* তখন-ই মনে হয় শঙ্খ ঘোষের সেই কবিতাটার লাইনগুলো—

"কিছুই কোথাও যদি নেই
তবু তো কজন আছি বাকি
আয় আরও হাতে হাত রেখে
আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি"

Scanned with OKEN Scanner

আবার তাঁর *যবনিকা পতন* উপন্যাসটি যন্ত্রস্থ এবং স্বভাবতই প্রকাশক ভীত, দোলাচলচিত্ত—'এরা, ওরা এবং আরও অনেকে'র পণিতি দেখে। বুদ্ধদেব নিজে নিলেন প্রকাশকের ভূমিকা, 'গ্রন্থকার মণ্ডলী" নামক প্রকাশনা সংস্থা থেকে বার করলেন নিজের *একটি কথা* ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *আমরা* নামক ষোলো পৃষ্ঠার দুটি কবিতার বই! আরও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হলেন শ্রী বিষ্ণু দে, তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ *উর্বশী ও আর্টেমিস* নিয়ে এই সংস্থার মধ্যে দিয়ে।

তবে সবকিছুরও হয়ত একটা আনুষ্ঠানিক ছেদ পড়ে অনানুষ্ঠানিক ভাবে। সেই *প্রগতি*র সময় থেকে বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য'র হৃদ্যতা—যেখানে বুদ্ধদেব অচিন্ত্যকে চিঠি লেখায় কুণ্ঠাহীন ভাবে কৃতজ্ঞ—"তোমার চিঠিখানা পড়ে ভারি আনন্দ হল। এক একবার নতুন করে প্রগতির প্রতি তোমার যথার্থ প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাই—আর বিস্ময়ে ও আনন্দে মনটা ভরে যায়! আমরা নিজেরা দু'চারজন ছাড়া *প্রগতি*কে এমন গভীরভাবে কেউ cherish করে না একথা জোর করে বলতে পারি। প্রথম যখন *প্রগতি* বার করি তখন আশা করিনি তোমাকে এতটা নিকটে পাওয়ার সৌভাগ্য হবে।" ক্রমাগত এই বন্ধুত্ব প্রগতি *কল্লোলে*র সীমা ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত স্তরে গিয়ে পৌঁছে ছিল। সেখানে দেখি বুদ্ধদেব অচিন্ত্যের বিবাহের সিদ্ধান্তে কিঞ্চিৎ আশঙ্কিত—"হঠাৎ বিয়ে করা ঠিক করে ফেললে যে? আমার আশঙ্কা কি জানো? বিয়ে করে তুমি একেবারে তৈলস্নিগ্ধ সাধারণ ঘরোয়া বাঙালী না বনে যাও।" অর্থাৎ বুদ্ধদেবের কাছে অচিন্ত্যকুমার এক অসাধারণ পুরুষ হয়ে ছিলেন বরাবর এবং এই একই ভাবে বুদ্ধদেবও অচিন্ত্য'র কাছে। তাই তাঁদের ধারাবাহিক কাজের প্রবহমনতায় ছেদ পড়তে বুদ্ধদেবের ভাল লাগেনি—'অচিন্ত্য ল'য়ের সঙ্গে লভ করছে'—সত্যিই তো ১৯৩১ এ অচিন্ত্যকুমার অস্থায়ী মুন্সেফের চাক্‌রি শুরু করলেন। সেখানে ক্রমাগত পদোন্নতি—সাব জাজ, জেলা জজ এবং ল'কমিশনের স্পেশাল অফিসার পদে উন্নীত হলেন। পেশাগত জীবনের চাপ বাড়তে লাগল সেই ১৯৬০ এ চাক্‌রি থেকে অবসর নেবার আগে পর্যন্ত। ফলত নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যচর্চায় ভাঁটা পড়লো বৈকি! তবুও *কল্লোল* যুগের দুই কাণ্ডারির পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভালবাসা অক্ষুণ্ণ থাকলেও যুগলের একত্র সাহিত্য সাধনায় পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেল। প্রগতির সমাপ্তি, *কল্লোল* মিয়মান এবং অবসান হল ক্রমে। বুদ্ধদেব তাঁর 'কবিতা' পত্রিকা বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং অধ্যাপনার মধ্যে দিয়ে আজীবন সাহিত্যের চর্চা সক্রিয়ভাবেই চালিয়ে যেতে পারলেন। কিন্তু বৃত্তিগত দিক দিয়ে অচিন্ত্যর কাজের ধারা ভিন্ন হয়ে গেল; তাই আরো অনেক কিছু পাওয়া থেকে

Scanned with OKEN Scanner

জীবনানন্দকে একবার জীবনানন্দের প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ের তেতলা বা চারতলা থেকে সঙ্গে করে নিয়ে কোথাও বেরোবার পরিকল্পনা করার সাহস দেখান এই বুদ্ধদেব-অচিন্ত্যই। বলা বাহুল্য তাঁরা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবু এই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হবার সাহস এঁরা দুজনেই দেখিয়েছিলেন। কিন্তু জীবনানন্দ আজীবন সবার মতো এঁদের কাছেও 'অবগুণ্ঠিত ব্যক্তিত্ব' হয়েই শ্রদ্ধার আসনে রয়ে গিয়েছিলেন। একেবর পর এক উৎকৃষ্ট লেখার মধ্যে দিয়েই তাঁর পরিচয়। বুদ্ধদেব আর জীবনানন্দ'র চলার পথে দেখা হলে; বুদ্ধদেব তাঁকে এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেলার চেষ্টা করেন; অপ্রস্তুতভাবে জীবনানন্দ কিছু অর্থহীন বাক্যবিনিময় করে দ্রুত হাঁটা দেন সলজ্জ ভঙ্গিতে। আর অচিন্ত্যকুমার ও মাঝে মাঝেই জীবনানন্দের 'ডেরা'য় হানা দিতেন বা তাঁকে অদূরে *কল্লোল* এর অফিসে 'টেনে' আনতেন 'জোর করে'। কিন্তু এই আড্ডাবাজদের সংস্পর্শে এসেও জীবনানন্দ কখনো 'আরাম' বা স্বস্তি পাননি। তাই নিজের তৈরি এক বর্মের মাঝেই স্বল্পভাষী জীবনানন্দ কখনো বুদ্ধদেব বা অচিন্ত্যর সঙ্গে প্রয়োজনমাফিক লেখা বা চিঠির মাধ্যমেই তাঁর মনের মাধুরী এঁদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে আলাপের প্রথমে জীবনানন্দ অচিন্ত্যের হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন ঘরে—'একেবারে তার হৃদয়ের মাঝখানে।' অচিন্ত্যকুমার আর বুদ্ধদেব কাজী নজরুল ইসলামের পেলব সান্নিধ্যে নিজেদের তাঁরা আপ্লুত করেছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁর *আমার ছেলেবেলা, আমার যৌবন* আর অচিন্ত্য তাঁর *কল্লোল যুগ* এ তাঁদের নজরুল স্তুতি গভীর মমতায়, শ্রদ্ধায় আর ভালবাসায় এক আদুরে পেলবতায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। অচিন্ত্যের কাছে নজরুল যদি 'গ্রীষ্মের রুক্ষ আকশে যেন মনোহর ঝড়' হ'ল—তাহলে বুদ্ধদেবের নজরুল হলেন 'কণ্ঠে তাঁর হাসি, কণ্ঠে তাঁর গান, প্রাণে তাঁর অফুরান আনন্দ—সব মিলিয়ে মনোলুণ্ঠনকারী একটি মানুষ।" দু'জনেই নজরুলের প্রেমে মজে ছিলেন অকুণ্ঠ ভাবেই। শুধু কি নজরুল? রবীন্দ্রনাথের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা রেখেও তাঁর ছায়া থেকে একটু সরে এসে; কিন্তু তাঁকে বিন্দুমাত্র অস্বীকার করার স্পর্ধা না দেখিয়ে যে, সমঝোতা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল; তার কৃতিত্ব-ও কিন্তু অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব যুগলের—"রবীন্দ্রনাথের জাল থেকে বেরোবার চেষ্টায় আমরা কোন বিকল্প খুঁজছি তখন—মাতৃভাষায় এমন কোন কাব্যাদর্শ যাতে নতুনের ইঙ্গিত আছে।... একদিন আমরা খুঁড়ে বের করলাম ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাসকে—টুনু, আমি, অচিন্ত্য; অচিন্ত্য উদাত্ত স্বরে আওড়ায় তার পয়ার-ত্রিপদী, টুনু বা আমি প্রশস্তি-লিখলাম *প্রগতির* দু-কিস্তি জুড়ে; তাঁর কাঁচা, কড়া, অশিক্ষিত

Scanned with OKEN Scanner

প্রিয়ংবদা দেবী; যিনি ছিলেন *প্রগতি*র একমাত্র মহিলা সাহিত্যিক। *প্রবাসী* কর্তৃক সম্মানিতা বর্ষীয়সী এই নারীর সাক্ষাৎ পেতে অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব দুজনে এক গ্রীষ্মের সকালে তাঁর বাড়ি গেলেন। প্রিয়ংবদা দেবী অল্প বয়সী তরুণদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরা জল টল কিছু খাবে?" লাজুক সাক্ষাৎ প্রার্থীরা সংকোচে 'না' বলায়—তিনিও আর এ বিষয়ের পুনরুক্তি করলেন না। প্রিয়ংবদা দেবীর সঙ্গে তাঁদের এই সাক্ষাৎ খুবই ফলপ্রসু হলেও তিনি অনবদ্য কৌতুকপ্রিয়তায় পরে লিখলেন, "কবুল করা ভাল, এতে আমরা ঈষৎ নিরাশ হয়েছিলাম, কিন্তু জলযোগের অভাব সত্ত্বেও সেই সাক্ষাৎ ব্যর্থ হয়নি।"[১৫] অর্থাৎ প্রৌঢ়ত্বের সীমা ছাড়িয়ে ১৯৭৭ এ যখন তাঁর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে—তখন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু তাঁদের যৌবনের এই ঘটে যাওয়া মিঠে স্মৃতিটি যে ভুলতে পারেননি; মনের কোণে বেশ মনে রাখার মতো দাগ কেটেছিল তা জানাতে ভোলেননি। সামান্য ঘটনার অসামান্য অভিব্যক্তি। আর তাঁর রসিকতা যাকে বলে witty তো সর্বজনবিদিত। নিজেকে কখন বয়সের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে খোলা মনে সব বয়সীদের সমবয়সী হয়ে গিয়েছিলেন। তাই কী রবীন্দ্রনাথ, কী দিলীপকুমার রায় বা নজরুল অথবা জীবনানন্দ থেকে তাঁর ছাত্ররা যেমন নবনীতা দেবসেন—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা নরেশ গুহ কিংবা জামাতা বা জামাতার চেয়ে বেশি যিনি বন্ধু সেই জ্যোতির্ময় দত্ত—সবার মনেই তাঁর অবাধ বিচরণ—অনায়াস আনাগোনা। নিজের উপস্থিতিকে দেশ-কাল সীমার গণ্ডী ছাড়িয়ে তিনি নিজেকে মেলে দিয়েছিলেন। হয়েছিলেন যুগোপযোগী— এ তো *কল্লোল* এরই দান—*প্রগতি*র দান।

অচিন্ত্য'র wave length-ও ছিল এই কনিষ্ঠ বন্ধুরই সমকক্ষ। তার serious লেখার মধ্যেও এই কৌতুকপ্রিয়তা অব্যাহত। *কল্লোল যুগ* এর ছত্রে ছত্রে এই হাস্য-রসের সন্ধান পাওয়া যায়। নিছক প্রবন্ধ বা statement নয়—এক অনাবিল আনন্দ পাওয়া যায় পাতায় পাতায়। প্রথম পাতা থেকেই মজা। সেই নীহারিকা! "আর এমন আশ্চর্য, একটি সদ্য পাওয়া কবিতা নীহারিকা দেবী নামে *প্রবাসী*তে পাঠাতেই পত্রপাঠ মনোনীত হয়ে গেল।" নিজের ভাগ্য প্রসন্ন দেখে বন্ধু সুবোধ দাশগুপ্তকেও সুপরামর্শ তাঁর। অদ্ভুত বুদ্ধিময়তা—"বললাম, নাম বদলাও। নীহারিকার সঙ্গে মিলিয়ে সে নাম রাখলে শেফালিকা। আর সঙ্গে সঙ্গে সেও হাতে হাতে ফল পেল।" খুব মনে পড়ছে *কমলাকান্তের দপ্তর* এর রসিকতাগুলোর কথা। তবে সেখানে আঁতে ঘা লাগানো চাবুক ছিল witty গুলোর মধ্যে। *কল্লোল যুগে* এও কম না। *কল্লোল যুগ* বইটি শুধু অচিন্ত্য সেনগুপ্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নয়—বাংলা

Scanned with OKEN Scanner

'তুমি নব বসন্তের সুরভিত দক্ষিণ বাতাসে
ক্ষণতরে বিকম্পিত করি গেলে বাণীর কানন—

...তখন কে জানত এই লেখকই একদিন *কল্লোলে*—তথা বাংলা সাহিত্যে গৌরবময় নতুন অধ্যায় রচনা করবে![৫] আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বুদ্ধদেব যখন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঢাকা-কলকাতা জীবনের মাঝে উদ্‌ভ্রান্ত বা বোহেমিয়ান, বিভ্রান্ত—এই লড়াইয়ে তাঁর সব থেকে বেশি পাশে দাঁড়াবার আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু একমাত্র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-ই, নিছক আশ্বাস-ই নয় কিন্তু; কাজে করে দেখানোর কাজটা প্রথম অচিন্ত্যই করে দেখালেন। ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বার্ষিক পরীক্ষার পর, গ্রীষ্মের ছুটিতে 'প্রথম দূর পথে এস্কটহীন' বুদ্ধদেব কলকাতায় এলেন। চুম্বকের মতো তাঁকে টানছিল ১০/২ পটুয়াটোলা লেন,—"আমি জেনে এসেছি আমি *কল্লোলেরই* একজন, *রজনী হ'লো উতলা* নামে আমার এক গল্প দীনেশরঞ্জন গ্রহণ করেছেন। সেটা অচিন্ত্যকুমারের হাতে দিয়ে আমি বলেছিলাম, 'গল্পটা একটু মর্বিড'। অচিন্ত্য হেসে বলেছিলেন, 'আমরা মর্বিড লেখাই পছন্দ করি।'[৬] বুদ্ধদেবের সকৃতজ্ঞ স্বীকারোক্তি—" *কল্লোল* আপিশে অনেকের সঙ্গে চেনাশোনা হ'য়ে থাকলেও আমাকে তখন পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে কাঠে টেনেছিলেন শুধু অচিন্ত্য।"[৭] *রজনী হ'ল উতলা* অচিন্ত্য ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ পছন্দ করেছিলেন। তাঁর '*কল্লোল যুগ*' বই এর ২/৩ পৃষ্ঠা জুড়ে সেই উপন্যাসের অংশ বিশেষ তুলে দেওয়াই তা প্রমাণ করে। অপরিচিত এক প্রতিভাবানের প্রতিভার স্বীকৃতি এভাবেই হয়তো দিয়েছিলেন তিনি প্রথমাবধিই। আর মানুষ বুদ্ধদেবকেও ভারি ভালবেসেছিলেন অচিন্ত্যকুমার আলাপের প্রথম থেকেই। অনবরত সিগারেট খাওয়া, ছোটখাটো উচ্চতার বুদ্ধদেবকে অচিন্ত্য কল্লোলের অফিসে প্রথম দেখেন। বিধি-নিষেধের তোয়াক্কা করেন না সেই বুদ্ধদেব—"তাই এক নিশ্বাসেই মিশে যেতে পারলো *কল্লোলের* সঙ্গে—এক কালস্রোতে।" অচিন্ত্যের সূক্ষ্ম জহুরীর চোখ কী প্রগাঢ়ভাবে চিনে ফেলেছিলেন তাঁর দোসরকে—"বড় ভাল লাগলো বুদ্ধদেবকে। তার অনবির্ধ শরীরে কোথায় যেন একটা বজ্র কঠোর দার্ঢ্য লেখা রয়েছে, অনমনীয় প্রতিজ্ঞা, অপ্রমেয় অধ্যবসায়।" প্রায় নিজে থেকেই চেয়েনিলেন বুদ্ধদেবের গল্পটি—। বুদ্ধদেব একটু কুণ্ঠিত—'গল্পটা হয়তো মর্বিড।'

'হোক্ গে মর্বিড। কোনটা রুগ্ন কোনটা স্বাস্থ্যসূচক কোন বিশারদ তা নির্ণয় করবে। আপনি দিন। নীতিধ্বজদের কথা ভাবনে না।'[৮] বেশ হৈ হৈ পড়ে গেল *কল্লোল-এ রজনী হ'ল উতলা*। গতানুগতিকতাকে ছাপিয়ে এমন লেখাই তো চায়

কল্লোলের মনোগত সুপ্ত বাসনা অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবের দৃপ্ত ঘোষণার মধ্যে দিয়ে সূচিত হয়েছিল অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েও। এরা যেন মুখপাত্রের ভূমিকা নিয়েছিলেন *কল্লোল* যুগের। বয়সে কনিষ্ঠ বুদ্ধদেবকে বরাবর মানসিক-সমর্থন যুগিয়েছিলেন অচিন্ত্য, দিয়েছিলেন শ্রদ্ধার আসন; 'বাংলা সাহিত্যে নতুন অধ্যায় যোজনাকারী হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন এই দুজন কাণ্ডারীর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। অচিন্ত্য'র সঙ্গে তাঁর তুই-তোকারিক সম্পর্ক ছিল কিংবা চলার পথের বাঁকে বাঁকে বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রেও বন্ধুপ্রাপ্তির অভাব ঘটেনি। কিন্তু অচিন্ত্যর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মধ্যে সেই যে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি;' যে spark রচিত ও গ্রহিত হয়েছিল তা বিরল আর তা যে কল্লোলের আকাঙ্ক্ষিতই ছিল। অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবহীন *কল্লোল* কি কষ্ট-কল্পনাতেও আনা যায়?

প্রথমেই বলেছি বুদ্ধদেবের সাহিত্য বিকাশে বা জীবন অন্বেষণে—দুজায়গাতে অচিন্ত্যের অমূল্য প্রভাব রয়েছে। কলকাতায় মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবার পর রোজগারের একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথম অচিন্ত্যই কিন্তু করে দিলেন বুদ্ধদেবকে। গৃহশিক্ষকের চাক্‌রী—বুদ্ধদেবের ভাষায় 'ট্যুশনিটা অচিন্ত্যর উপহার'। অচিন্ত্য'র ছাত্রকে বুদ্ধদেবের জিম্মায় রেখে তিনি যখন মুন্সেফি নিয়ে মফস্বলে চলে গেলেন, সেখানেও কিন্তু বুদ্ধদেবের জন্য কিছু একটা রোজগারের বন্দোবস্ত করাটাও তাঁর কাছে কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল। আর প্রসঙ্গত বলা যায়; সেই ছাত্রই আবার পরবর্তীকালে সিগনেট প্রেসের স্থাপন কালে ও বিজ্ঞান অফিসের অধিকর্তা থাকার সময় বুদ্ধদেবের সঙ্গে আবার পথ চলা শুরু করেন; যাঁর লেখার ছাঁদটি বুদ্ধদেবের মতে অচিন্ত্যের তৈরি ছিল। বুদ্ধদেব সেই ছাত্রের লেখা কবিতা-গল্প তৎকালীন জনপ্রিয় পত্রিকা *রামধনুতেও* পাঠিয়েছিলেন—প্রকাশিতও হয়েছিল তা। এই যে বন্ধু-ছাত্র পরম্পরা, পারস্পরিক কৃতজ্ঞতাবোধ, সাহায্য করা, একে অন্যের প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়া, সুযোগ পেলেই অন্যকে সুযোগ করে দেওয়া, বিপদে-প্রয়োজনে বা অয়োজনে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়া—এই সহজাত সুন্দর স্বভাবের অধিকারী ছিলেন অচিন্ত্যকুমার। আর বুদ্ধদেবও যখনই সুযোগ পেয়েছেন একরকম ঋণ শোধ করার সুযোগও হাত ছাড়া করেননি। *প্রগতি* তার প্রমাণ। তাঁর ১৯৩৪ এ প্রকাশিত উপন্যাস *বিসর্পিল* তার প্রমাণ—যা সম্মিলিতভাবে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্য সেনগুপ্তের সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন তিনি। ১৯৩২-৩৩ এর শীতে অন্য কয়েকজন লেখকের মতো বুদ্ধদেবের সদ্য প্রকাশিত 'এরা, ওরা এবং আরও অনেকে' অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হল। আদালত পর্যন্ত গড়ানো এই মামলায় হার স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন বুদ্ধদেব। ঠিক এই সময়ই

Scanned with OKEN Scanner

তবুও এই ২০২২-এ এসে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মূল মন্ত্র 'ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্' রঞ্জিত, ১৪২৭, এর ১৯১-তম 'মাঘোৎসব'-এর আমন্ত্রণ পত্রের নিবেদনের সূচনায় যখন দেখি উজ্জ্বলভাবে লেখা আছে, 'ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের মানস স্বপ্ন ছিল যে মানুষে মানুষে মৈত্রী বন্ধনের দ্বারা ও তাহার উপায়স্বরূপ এক মন্দিরে এক পরমেশ্বরের একত্রে উপাসনার দ্বারা প্রথমতঃ ভারতে, পরে সর্বজগতে মিলন ও ঐক্য স্থাপিত হবে' তখন শ্রদ্ধাবনত হই। এই স্বপ্নকে লালন করে এখনও যাঁরা রামমোহনের আদর্শকে অন্তরের গভীরে রেখে, বছর বছর সাধ্যমতো তাঁদের কৃষ্টির ধারাকে বজায় রেখে চলেছেন এবং পরবর্তীরাও যাতে এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন অনেক সাধুবাদ তাঁদের প্রাপ্য। ব্রাহ্মদের সংখ্যা কখনওই বেশি ছিল না; আজও নেই। তাই Quantity নয় Quality- বা উৎকর্ষতার নিরিখে ব্রাহ্ম সমাজ সফল। রাজা রামমোহনের স্বপ্ন সফল।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জী:

(১) মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত ঃ শ্রী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা। ২১১নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেস অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন - ১৩১৮।

(২) রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য ঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১০প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলিকাতা-১৬, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতা' ১৯৬৫।

(৩) ভারত পথিক রামমোহন ঃ সুকুমার মিত্র, নিউ স্ক্রিপ্ট, এ ১৪ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা-৭, প্রথম প্রকাশ ঃ ভাদ্র ১৩৮৬।

(৪) বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা ঃ গোপাল হালদার, অরুণা প্রকাশনী, ৭, যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা-৬, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ।

(৫) ব্রহ্ম সঙ্গীত ঃ দশম সংস্করণ, আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে, শ্রী কালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত, (মাঘ ১৮০৮ শক)।

(৬) কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই ঃ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, মিত্র পাঠাগার, প্রযত্নে শ্যামল কুমার মিত্র, খালোড়, বাগনান, হাওড়া, পিন-৭১১৩০৩।

Scanned with OKEN Scanner

গেছে বলা বাহুল্য। কিন্তু কলকাতার *কল্লোল* এর সঙ্গে ঢাকা'র *প্রগতি* উন্নয়নেও অচিন্ত্যকুমারের একাত্ম হওয়ার দান উল্লেখ না করে পারা যায় না। দুটি শহরে প্রায় একই সঙ্গে দুটি পত্রিকার বেড়ে ওঠা বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমারের মতো দুই কাণ্ডারির প্রবল ও কোমল সাহচর্যে। এখানে *প্রগতি*র কথা একটু বলা প্রয়োজন। ১৯২৭ এর জুলাই মাসটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো সময়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি অনার্সে ভর্তি হলেন বুদ্ধদেব বসু। আর ওই সময়েই কবি অজিত দত্তের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনা ও যৌথ আর্থিক দায়িত্বে *প্রগতি* ছাপার অক্ষরে প্রথম আত্মপ্রকাশ করল। এখানে উল্লেখযোগ্য এর আগে ম্যাট্রিকের ফল আশানুরূপ না হওয়ায় (পঞ্চম স্থান) মনঃক্ষুণ্ণ বুদ্ধদেব আশাভঙ্গের যন্ত্রণা পার করে আই.এ. তে বৃত্তি সহ দ্বিতীয় স্থান পেলেন এবং সেই বৃত্তির অর্থই *প্রগতি*কে জন্ম দিতে সাহায্য করেছিল অনেকাংশেই। প্রথমেই সেই দুই মানুষ যাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাবার প্রথম সুযোগ হাতছাড়া করলে না সম্পাদক বুদ্ধদেব, তাঁরা হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আর ডক্টর প্রভুচরণ গুহঠাকুরতা ওরফে বুদ্ধদেবের প্রিয় 'বুদ্ধুদা'। *প্রগতি*র 'প্রথম সংখ্যা'র 'প্রথম রচনা'টি ছিল অচিন্ত্যকুমারের অষ্টাদশপদী কবিতা—"আমার পরাণ মুখর হয়েছে সিন্ধুর কলরোলে" এবং প্রভুচরণ গুহঠাকুরতার পিরানদল্লা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ। শুধু তাই নয় *প্রগতি*র প্রথম বছরে অচিন্ত্যকুমারের *বেদে* ও *বিবাহের চেয়ে বড়ো* এবং আরো কিছু কিছু রচনা উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল।

কল্লোল তখন বেশ তরতরিয়ে চলছে। তবে প্রথম থেকেই তো চলার পথ তার সুগম ছিল না সুবোধ সেনগুপ্ত, গোকুল নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ প্রতিভাদের মহামিলনে *কল্লোল* ক্রমশ দানা বাঁধতে শুরু করল। গোকুল নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, মণীন্দ্রলাল বসু, সুনীতি দেবী মিলে 'ফোর আর্টস ক্লাব' গড়ে তুলেছিলেন। এই চারজনে *ঝড়ের দোলা* নামের একটি গল্পের বই বের করলেন। একটি মাসিক পত্রিকা বের করার পরিকল্পনা ফলপ্রসু হবার আগেই 'ক্লাব'টির যবনিকা পতন হল। স্বপ্ন ভেঙে গেলে হতাশা আসে বৈকি! তবে উত্তরণের পথ খুঁজতে দেরি হয় না। অচিন্ত্যকুমারের লেখায় পাই গোকুল নাগের কথা—"আমার ব্যাগে দেড় টাকা আর দীনেশের ব্যাগে টাকা দুই—ঠিক করলুম *কল্লোল* বের করব।"[২] সেই টাকায় কাগজ কিনে, হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে চৈত্র সংক্রান্তির দিন দুই বন্ধু সেগুলো বিলোনো—গোকুল নাগের কথায় স্মৃতিমেদুর-স্মৃতিরোমন্থন। সেই ১০/২ পটুয়াটোলা লেন, *কল্লোলে*র অফিসে অচিন্ত্যকুমারের আবির্ভাব। সত্যিই আবির্ভাব-ই বটে। তারপর সবটাই গৌরবময় ইতিহাস। 'ফোর আর্টস ক্লাব' উঠে যাওয়ার বিষণ্ণতা থেকে গোকুলনাগকে উদ্দীপিত করতে অচিন্ত্যের

Scanned with OKEN Scanner

দ্বিধাগ্রস্থ। তাঁর মনের উপর *প্রগতি* সম্পর্কিত বুদ্ধদেবের দুঃস্বপ্ন, বিহ্বলতা কতটা গুরুত্ব পেয়েছিল, যার প্রমাণ *কল্লোল যুগের* বহু পাতাজুড়ে দেখতে পাই। শেষের দিয়ে *প্রগতির* শেষ বেলা যখন আসন্ন; পত্রিকা চালানো এক রকম দায় হয়ে উঠেছে; তখনও সেই অচিন্ত্য'রই মুখাপেক্ষী বুদ্ধদেব—"*প্রগতি* সত্যি সত্যি আর চলল না। কোনোমতে জ্যৈষ্ঠটা বের করে দিতে পারলেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তবু যদি কখনো অর্থাগম হয়, আবার কি না বার করবো?..." ভাবখানা যেন এমন বন্ধু অচিন্ত্যকে এ চিঠি লিখে হালকা হবার একটা উপায় তো হ'ল। পরের দিকে যখন সত্যিই আর *প্রগতি* চালানো সম্ভবপর হ'ল না সেই 'প্রগতি তিরোধান' সংবাদটিও বুদ্ধদেব অচিন্ত্যর মাধ্যমেই তাঁর কল্লোলের অন্যান্য বন্ধুদের অবগত করার আর্জি জানিয়েছিলেন—'*প্রগতির* মৃত্যু সংবাদ কলকাতায় ব্রডকাস্ট করে দিয়ো।" আবার সেই প্রগতিকে ভরাডুবি হবার পরও তাকে টেনে তুলতে অচিন্ত্যকে বুদ্ধদেব চিঠি লেখেন—'তোমার কাছে কিছু সাহায্য চাই। পাঁচটা টাকা তুমি সহজেই spare করতে পারো।' বন্ধুত্বের এই জোরটা যেন শুধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকেই করা যায়।

প্রগতি পর্ব নিষ্পত্তি হল বটে। যদিও বুদ্ধদেব বারবার বলতেন *প্রগতি, কল্লোল* অভিন্ন; তাদের চাহিদা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এক। আর সর্বোপরি কল্লোলের অচিন্ত্যকুমার *প্রগতির*ও স্তম্ভস্বরূপ। তথাপি বুদ্ধদেবের কলকাতাকে ক্রমশ আঁকড়ে ধরার মধ্যে দিয়েই 'পুরানা পল্টনের' বিদায় ঘোষিত হ'ল যেন। কলকাতা তাঁর কাছে 'অতিবৃহৎ ও মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' হয়ে উঠল তার সবটুকু ভালবাসা নিয়ে। তাই *কল্লোল-প্রগতি* শেষ হয়েও যে শেষ হয়ে যায়নি, এর সুদূর প্রসারতার অসীম-সীমা এর আগে কিশোর বুদ্ধদেব টের পাননি। তাঁর পরিচিতির মূল বীজ কিন্তু সেই প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য- বুদ্ধদেবের 'কল্লোলের ট্রায়ো'র মধ্যেই নিষিক্ত ছিল। ক্রমশ বন্ধু হলেন অতি অল্প বয়সে ইংরেজি ভাষায় অত্যন্ত পারদর্শী সমর সেন, কিছু পরে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কুমিল্লার *পূর্বাশার* সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ'রা। *কল্লোলে*ও আনাগোনা হ'ল অচিন্ত্যের আরো বন্ধুদের সুকুমার ভাদুড়ী, সুবোধ রায় আরো কে নয়। একের পাশে অন্যের কাঁধ মিলিয়ে থাকার যুগ সেটা—'বন্ধুতার যুগ, কমরেডশিপ বা সমকর্মিতার যুগ।' তবুও বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য'র নিরবচ্ছিন্ন বন্ধুতা অন্য এক মাত্রা এনে দিয়েছিল। ঢাকা- কলকাতা বা পুরী বেড়াতে যাওয়া কিংবা জীবনানন্দ দাশ' যিনি বড়ো নিভৃত কবি জনসমুদ্র নয় পছন্দ নয় তাঁর—সেই তাঁকেও কবিমহলে প্রায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বলা যেতেই পারে। কোলাহল ও প্রচারবিমুখ

Scanned with OKEN Scanner

ISSN 0976-7398

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সংখ্যা

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক যাণ্মাসিক
অষ্টাদশ বর্ষ ❑ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ১৪২৯

সম্পাদক
উত্তম পুরকাইত

উজাগর প্রকাশন
শিবানন্দধাম, সিজবেড়িয়া, উলুবেড়িয়া, হাওড়া
ভ্রাম্যভাষ ৯৮৩০৫১৩২২৪/৮৯১০১৭৯৮১৪
uttamujagar@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

বুদ্ধদেবের অচিন্ত্যকুমার

রেশমী মিত্র

"ভাই অচিন্ত্য,

বহুকাল পরে আজ বিকেলে তোমার চিঠি পেলাম। আজ সকালেই তোমাকে এক কার্ড লিখেছি, তবু আবার না লিখে পারলাম না।

প্রগতি নিশ্চয়ই পেয়েছ— আগাগোড়া কেমন লাগলো জানিয়ো। তোমার কাছ থেকে *প্রগতি* যে স্নেহ ও সহায়তা পেল তার তুলনা নেই। এই ব্যাপারে আমরা কত নিঃস্ব ও নিঃসহায়— ভেবে ভেবে এক এক সময় আশ্চর্য লাগে। লাভের মধ্যে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন দুশ্চিন্তা, প্রচুর আর্থিত ক্ষতি ও আরো প্রচুর লোক নিদ্রা—একটি লোক নেই যে সত্যি-সত্যি আমাদের আদর্শের প্রতি সহানুভুতি সম্পন্ন। তবু কেন চালাচ্ছি? আমাদের মধ্যে যে Surplus energy আছে, তা এইভাবে একটা Outlet খুঁজে নিয়েছে। খেয়ে-পরে-ঘুমিয়ে নিশ্চয়চিত্তে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারব না, বিধাতা আমাদের এ অভিশাপ দিয়েছেন। তাই একটা কিছু করতে হয়, কোন একটা নেশায় নিজেদের ডুবিয়ে রাখতে হয়। আমার তো মনে হয় আমাদের জীবনে *প্রগতির* প্রয়োজন ছিল। যে শক্তি আমাদের ভিতর আছে তার যথোপযুক্ত ব্যাবহার না করলেই অন্যায় হত। তবে অর্থ-সংকটটাই বিশেষ করে পীড়াদায়ক। হাত একেবারে রিক্ত-কি করে চলবে জানিনে। তবু আশা করতে ছাড়িনে। তবু দমে যাই না। কেমন যেন বিশ্বাস জন্মেছে যে *প্রগতি* চলবেই যেহেতু চলাটা আমাদের পক্ষে দরকার।"—

শুরুতেই এই চিঠির দীর্ঘ অংশ বিশেষ প্রাসাঙ্গিক মনে করছি। একেই বোধ হয় সাহিত্যের ক্ষিদে বলে। প্রাপকের নাম অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আর প্রেরক বুদ্ধদেব বসু। আর এ চিঠি কতটা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল অচিন্ত্যকুমারের কাছে তা বুঝতে পারা যায় তার *কল্লোল যুগ* পড়লে। শুধু এই একটি চিঠি নয়, আরো মুল্যবান বুদ্ধদেব-পত্র ঠাই পেয়েছিল এই বইটিতে। *কল্লোল* আর 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত' বা 'কল্লোলের ট্রায়ো' অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব-প্রেমেন্দ্র তো সমোচ্চারিত—একটা মিথ্ হয়ে

Scanned with OKEN Scanner

অধীনস্থ ভারতের "Bengal Presidency কুমিল্লাতেই। দুজনের তিরোধান আগু-পিছু দু'বছরের ফারাক। বুদ্ধদেব ১৯৭৪ আর অচিন্ত্যকুমার '৭৬এ। যাইহোক দুই বন্ধুর বন্ধুতা-বীজ বোধহয় খুব শক্তভাবে গ্রথিত হয়েছিল ঢাকা-জীবনের এই পর্যায়েই। কল্লোলের ট্রায়োর মতোই এখানে প্রগতিরও এক ট্রায়ো তৈরি হয়ে গিয়েছিল যেন—'বুদ্ধদেব-অজিত দত্ত-অচিন্ত্য'। এই তিনে মিলে 'ঢাকা'কে নিয়ে মুখে মুখে অনবদ্য এক কবিতা তৈরি করলেন—যা *শনিবারের চিঠি*র এক ব্যঙ্গের প্রত্যুত্তর—

"ফাগুনের গুণে 'সেগুন বাগানে' আগুনে বেগুন পোড়ে,
ঠুনকো ঠাটের 'ঠাঠারিবাজারে' ঠাঠা ঠেকিয়াছে ঠিক;
ঢাকার ঢেঁকিতে ঢাকের ঢেঁকুর ঢিঢিক্কারেতে ঢোঁড়ে,
সং 'বংশালে' বংশের শালে বংশে সেঁধেছে শিক।"

(*কল্লোল যুগ* : পৃ. ১৬৩)

বুদ্ধদেব-অচিন্ত্যের বন্ধুত্বের প্রগাঢ়তা তাঁদের মননে, চিন্তনে, ভোর থেকে শুরু করে মধ্যরাত পর্যন্ত ছুঁয়ে থাকত। অচিন্ত্যকুমার ভারি মিষ্টি করে লিখলেন, "সবুজ ভোরের আলোয় চোখ চেয়ে মনে হত দুইজনে যেন কোন পাল-তোলা ময়ুরপঙ্খীতে চড়ে কোন নির্জন নদীতে পাড়ি দিয়েছি।" প্রসঙ্গত বলা দরকার *কল্লোল* এবং বছর তিনেক পর *কালি-কলম* (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) বের হয় মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায়। এতে দু'পক্ষেরই হয়ত কিছু মনোমালিন্য হতে পারে; কিন্তু হাতে লেখা পত্রিকা *প্রগতি* কিন্তু সেদিক থেকে অজাতশত্রু ছিলই বলা যায়। তবে পরের দিকে তো ছাপা অক্ষরে *প্রগতি* বের হল; কিন্তু *কালি-কলম* আর *প্রগতি* দুটির স্থায়িত্ব কালই স্বল্প। *প্রগতি*তে প্রথম বছর বারোটি সংখ্যা নিয়মিতই বের হয়েছিল। এ'ও এক সাফল্যেরই অধ্যায়। সে যাত্রায় অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবের ঢাকা ও প্রগতি জীবন যেন তাঁদের অন্তরাত্মার অভূতপূর্ব মিলনের সূচনা রচনা করেছিল। এর পর আপনি আজ্ঞের গণ্ডী পেরিয়ে তুমি; আর 'অচিন্ত্যবাবু' থেকে 'ভাই অচিন্ত্য' হতে সময় লাগেনি বয়সে কিঞ্চিত কণিষ্ঠ বুদ্ধদেবের।

বুদ্ধদেব যেন *প্রগতি*কে নিয়ে তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছু চিঠি লিখে উজাড় করে দিয়ে শান্তি পেতেন অচিন্ত্যকে; সে *প্রগতি*র হাতে লেখার শৈশব পেরিয়ে 'ছেপে' বের হবার খবর কিংবা নিত্য দিনের নৈরাশ্যের খবর যে এইবার বুঝি শেষ হয়ে গেল *প্রগতি*—তার সংবাদ। অচিন্ত্যও চিরনির্ভর চিরবন্ধু হয়েই বুদ্ধদেবের পাশে দাঁড়ানোয় অবিচল সুদূর কলকাতা থেকেই। *প্রগতি*র অস্তিত্ব নিয়ে তাঁর মনও

Scanned with OKEN Scanner

UJAGAR: ISSN 0976-7398

উজাগর

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সংখ্যা

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষাণ্মাষিক
অষ্টাদশ বর্ষ □ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা-১৪২৯

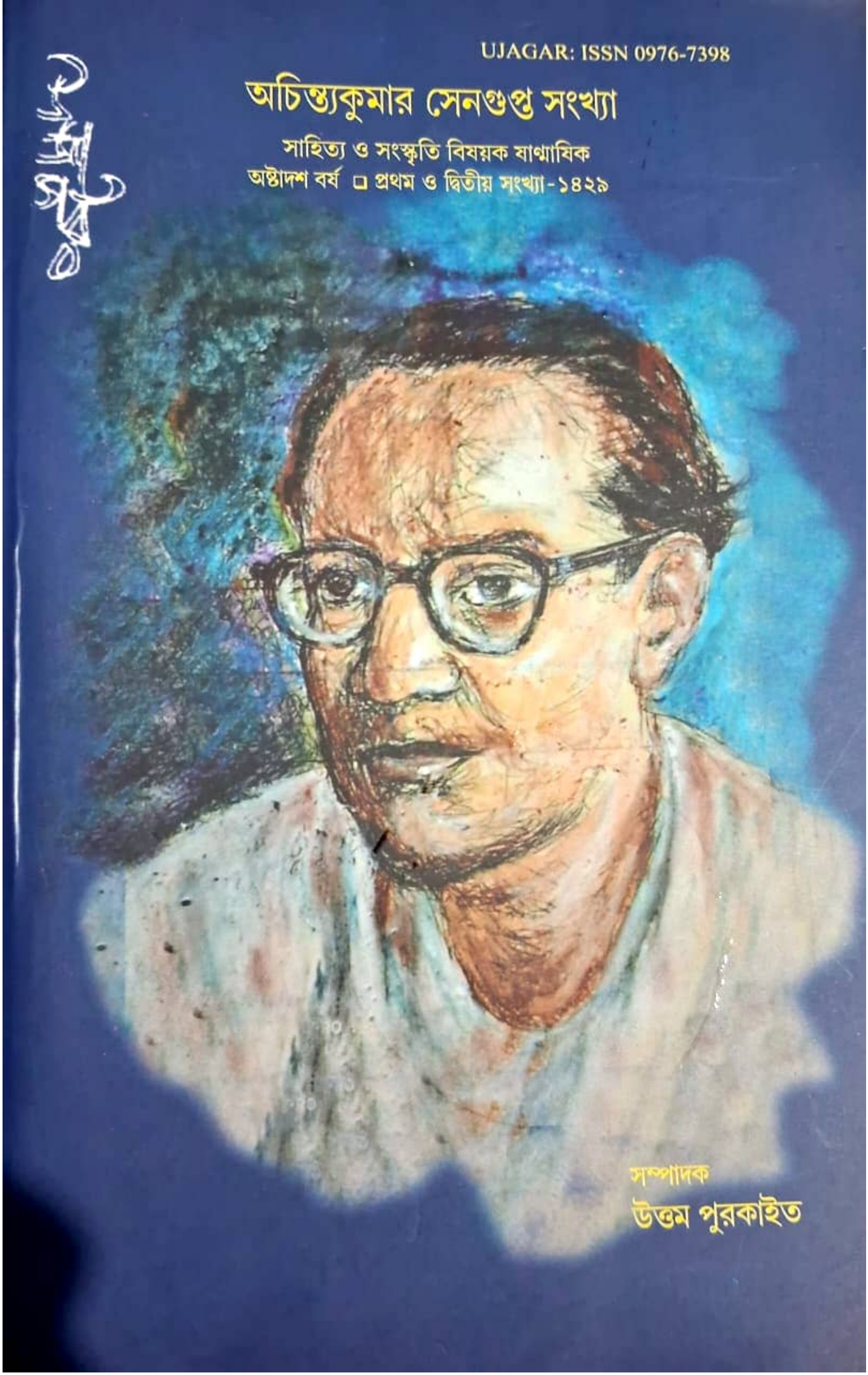

সম্পাদক
উত্তম পুরকাইত

Scanned with OKEN Scanner